বাতায়ন

কাগজের নৌকা

ধারাবাহিক

হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে
অতল, তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে চিনতে পারিনি বলে
হৃদি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে

করো আনন্দ আয়োজন করে পড়ো
লিপি চিত্রিত লিপি আঁকাবাঁকা পাহাড়ের সানুতলে
যে একা ঘুরছে, তাকে খুঁজে বার করো

করেছ, অতল; করেছিলে; পড়ে হাত থেকে লিপিখানি
ভেসে যাচ্ছিল – ভেসে তো যেতই, মনে না করিয়ে দিলে;
– ‘পড়ে রইলো যে।’ পড়েই থাকত – সে-কথা তুলবে বলে

কবি ডুবে মরে, কবি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে ॥

জয় গোস্বামী

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৮

সম্পাদনা

মানস ঘোষ

Issue Number 2 : November, 2018

Editor
Manas Ghosh, Kolkata, India

Editorial Team
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)

Coordinator
Manas Ghosh, Kolkata, India

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Design and Support
Susanta Nandi, India

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Benjamin Ghosh — **Front Cover & Illustrations**

বেঞ্জামিন ঘোষ (মাঙ্গল্য) এখনো স্কুলছাত্র। তবে তার যাবতীয় আগ্রহ আবর্তিত হচ্ছে, ছবি আঁকাকে ঘিরে । পেন্সিল স্কেচ, রং-তুলি ছাড়াও সে ভালবাসে বিভিন্ন অপ্রচলিত উপাদানকে শিল্পের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে। অন্যান্য কাজের সঙ্গে নিয়মিত কমিক্স এঁকে চলেছে ছোটদের একটি শিক্ষামূলক পত্রিকার জন্য । বাতায়নের ধারাবাহিক পত্রিকায় বেঞ্জামিনের এই প্রথম কাজ । অতএব আমাদের সঙ্গে সেও তাকিয়ে আছে পাঠকের প্রতিক্রিয়ার দিকে ।

Balarka Banerjee — **Front Inside Cover**

Balarka Banerjee — Balarka is a Molecular Biologist by profession and an executive in a Biotech company. Besides science his other passions are Drama — writing, acting, directing — Poetry and Art. He likes good cinema and music. He is a foodie and a good cook. No wonder he enjoys writing about his experiences and interests.

Durba Bandyopadhyay — **Inside Back Cover**

Durba Bandyopadhyay — Durba is a doctorate in Microbiology, currently a consultant with IMRB — Kantar for an UNICEF governed project on Health & Nutrition. Durba loves art, poetry and music.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ। রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

প্রথমেই আমাদের সমস্ত পাঠকবন্ধুদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের ভালোবাসা ও আগ্রহ বাতায়নের ধারাবাহিক সংস্করণ 'কাগজের নৌকা'র আত্মপ্রকাশের লগ্নটিকে স্মরণীয় করে তুলেছে। সংখ্যায় ও স্বতঃস্ফূর্ততায় যে অভাবনীয় সাড়া আমরা পেয়েছি, তাতে টিম বাতায়নের উৎসাহ ও দায়িত্ব বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গেল।

সাহিত্যিক মহলে প্রসিদ্ধ শ্রীনবকুমার বসু মহাশয় বা কবি পল্লববরনের লেখা নিয়ে আগে থেকেই একটা আগ্রহ তৈরী হয়েছিল, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিচিত লেখকদের রচনা পাঠক মননে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তা আমার কাছে নেহাত অপ্রত্যাশিত না হলেও, প্রায় নজিরবিহীন ও আশাব্যঞ্জক তো বটেই। এ কথা বলা যেতে পারে সাহিত্যআকাশের কয়েকটি ভবিষ্যত নক্ষত্র আলো ছড়াতে শুরু করেছে কাগজের নৌকা'র চলার পথে।

প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হয়েছিল শরতের এক আগমনী সন্ধ্যায়। বাঙালীর সেরা উৎসবের মাস কেটে গিয়ে বাতাসে এখন শীতের আগমনবার্তা। অল্প ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব। আর ঠিক এইসময়েই ভালোলাগার উষ্ণতা নিয়ে দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশ।

আপনারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, সুদীপা, বোধিসত্ত্ব বা পালি'র জন্য। কেউ উদগ্রীব সুনীল কি বলেন জানার জন্য। কেউ বা মশগুল লাদাখ ভ্রমণে। জলসার সেরা শিল্পীদের গান গাওয়া বাকী, এ সময় আমার আর বেশিক্ষণ স্টেজ আটকে রাখা উচিত নয়। অতএব আজ আসি।

আপনারা সবাই ভালো থাকবেন।

মানস ঘোষ।

সম্পাদক, কাগজের নৌকা

বাতায়ন বুলেটিন !

কোলকাতায় বাতায়ন

> “কবি শঙ্খ ঘোষ জানালেন, বাতায়ন পড়ে তাঁর ভালো লেগেছে। বললেন প্রবাসীদের এই পত্রিকা সত্যিই খুব পরিশ্রমী উদ্যোগ এবং প্রশংসার দাবী রাখে।”
>
> অনেক ধন্যবাদ জানাই বাতায়নের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু সাহিত্যিক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে, যিনি কবির এই প্রতিক্রিয়া আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

কবি শঙ্খ ঘোষের মত একজন প্রবাদপ্রতিম সাহিত্যিকের কাছ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ পাওয়াটাই সংকলনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। – এমনটাই জানালেন, বাতায়নের কর্ণধার অনুশ্রী ব্যানার্জী। অনেক যত্নে অনেক ভালোবাসায় গড়ে তোলা প্রবাসীদের সাহিত্যচর্চার এই প্ল্যাটফর্ম ধীরে ধীরে ডানা মেলছে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের পর অবশেষে এই বাংলায়। নানা দেশের সাহিত্যপ্রেমী মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণে পত্রিকার বাংলা ও ইংরাজি দুই বিভাগই যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তার সঙ্গে পাশে আছেন বাংলার কিছু খ্যাতনামা সাহিত্যিক। বিশ্বজুড়ে প্রবাসী লেখক – পাঠকের সাথে বাংলার এ এক অভিনব সেতুবন্ধন।

বাতায়নে সঙ্গে : কবি শঙ্খ ঘোষ ও সাহিত্যিক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়।

উন্মোচন :

কবি যশোধরা রায়চৌধুরীর সঙ্গে বাতায়ন সন্ধ্যা।

সিডনী, শিকাগোর পর এবারই প্রথম কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হল, বাতায়নের বার্ষিক ‘সংকলন’। ২রা সেপ্টেম্বর রবিসন্ধ্যায়, নিউ আলিপুরের ব্যানার্জী-ভিলায় বইটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন, কবি যশোধরা রায়চৌধুরী। স্বনামধন্যা কবির সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় ঋদ্ধ হলেন উপস্থিত নবীন সাহিত্যিকরা। এবারের সংকলনের প্রথম পর্ব জুড়ে আছে, দিগদর্শী কবি শঙ্খ ঘোষ ও তাঁর সৃষ্টি নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা। এরপর ছবি ও লেখায় ‘অস্ট্রেলিয়ায় শ্রীজাত’ ছাড়াও, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সাহিত্যিকের লেখায় সমৃদ্ধ সংকলনটি বাংলার পাঠকসমাজেও আদৃত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

স্নেহাশিষ ভট্টাচার্য লিখেছেন,

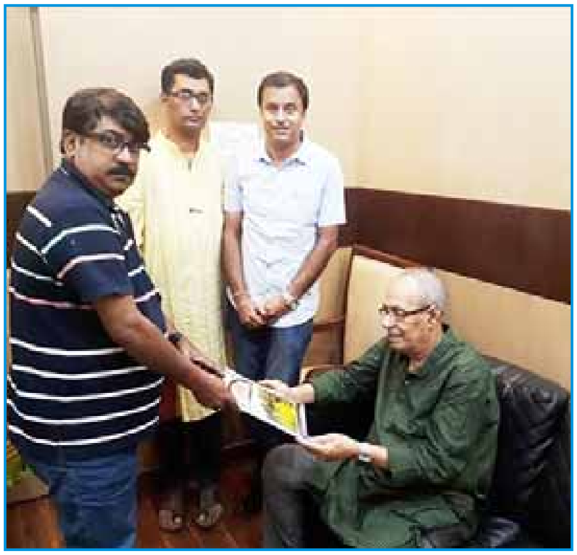

মহীরুহের ছায়ায় : সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সাথে বাতায়নের টিম কোলকাতা।

অঙ্কের নম্বর খারাপ, মনখারাপি দুপুর, বুরুনের একজন নিধিরাম ছিল। কতবার ভাবতাম যদি একজন নিধিরাম পেতাম । শেই শুরু, দুটো হাতই যে কারুর বাঁ হাত হতে পারে এই ভাবনাটা যিনি ভাবতে পারেন তাঁর কথা ভাববার চেষ্টা করতাম। মনোজদের বাড়িটা কতটা অদ্ভুত হতে পারে ধারাবাহিক ভাবে অপেক্ষা ছিল জানবার, কবচ সেটাও গৌড়ের, কবর সেটা একজন পাগলা সাহেবের, হীরের আংটির পরতে পরতে রহস্য জাল, হারিয়ে যাচ্ছে এক কাকাতুয়া, কোন এক অপয়ার মুখ দেখে পাতালঘর অভিযান ব্যর্থ, শুধু স্বপ্নের রাজত্বে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে প্রশ্নের মত প্রশ্ন ভৌত বিজ্ঞান ভুতের বিজ্ঞান কি না . . . . এক রুদ্ধশ্বাস ছোটবেলা আরো স্বাদ নিতে পারলো দূরবীনে চোখ রেখে মানব জমিনের কান ঘেঁষে পার্থিবের অপার্থিব সৌন্দর্যে এসে ঘুণ পোকার মত বই পোকায় পরিণত হয়ে।

আজ প্রবাসী বন্ধুদের নিরলস সাহিত্য সাধনা বাংলা ভাষা তথা বাংলাকে এক মালা গাঁথা সময় উপহার দিতে বদ্ধ পরিকর। আর তাই বাতায়ন মেলে ধরেছে নিজেকে তার মণিমুক্তো নিয়ে। আজ এক মায়াবী সন্ধ্যায় সেই বাতায়নের অঙ্গনে এক মহীরূহের স্পর্শ। সেই জাদুকর যাঁর ছোঁয়ায় ছিল কিশোর বেলার স্বপ্ন আর বাকি সময় জুড়ে শুধুই মুগ্ধতা, সেই স্বনামধন্য সাহিত্যিক শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভালোবাসার স্পর্শে জড়িয়ে গেল বাতায়নের সান্নিধ্য। আমরা যারা এই সেতুবন্ধনের সামান্য যোগসূত্র হতে পেরেছি, বাতায়নকে পৌঁছে দিতে পেরেছি এমন অনেক প্রাঙ্গণে, তারা আজ ধন্য এমন এক সাহিত্য পত্রিকার সাথে যুক্ত হতে পেরে। আজকের মায়াবী সন্ধ্যায় তাই বাতায়ন আবার ডানা মেললো এক পর্বতসম ব্যক্তিত্বের হাত ধরে আরো আরো অনেক দূরের উদ্দেশ্যে।

বাতায়নের নানা খবর আর ছবি আজকের বাতায়ন বুলেটিনে।

সোনার কাঠির স্পর্শ

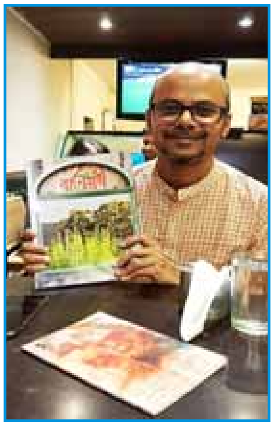

কবি শ্রীজাত

সান্নিধ্য

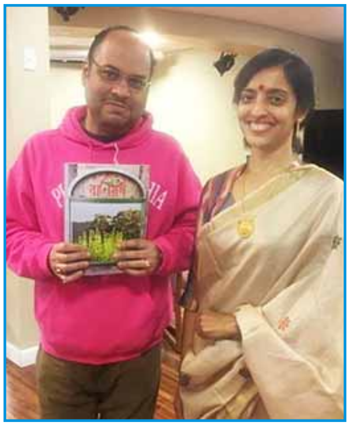

শিকাগোর অনুষ্ঠানে কবি বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, হাতে বাতায়নের "সংকলন" ও সাথে সম্পাদিকা রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়।

সেতুবন্ধন

কোলকাতায় অস্ট্রেলিয়ান ডেপুটি হাইকমিশনার প্রশংসা করলেন এই প্রচেষ্টার।

সূচীপত্র

ধারাবাহিক উপন্যাস

নবকুমার বসু	হটাবাহার	7

স্মৃতিকথা

সিদ্ধার্থ দে	সুনীল সাগরে	17

বড় গল্প

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য	অচেনা ঢেউয়ের শব্দ	20

রম্যরচনা

দেবীপ্রিয়া রায়	একদিন যারা	23
স্বর্ভানু সান্যাল	আই-টি ভাইটি	26

কবিতা

পল্লববরন পাল	সনেটগুচ্ছ	30

ভ্রমণ

মৌসুমী রায়	লাদাখ ভ্রমণ	31

নবকুমার বসু

পর্ব ২

হটাবাহার

এদিকে একটু সেট্‌ল করার পরে . . . তুমি কিছুদিন কলকাতায় ঘুরে এসো। অ্যায়াম শিওর য়্যু ফিল রিল্যাকসড।

শ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন সুদীপা। ব্যাপারটা তাঁর মাথাতেও যাতায়াত করছে।

বিগত তেইশ-চব্বিশ দিনে কমই ফুরসৎ পেয়েছেন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববার। তারমধ্যেই দেশে এবং আত্মীয়স্বজনের কাছে যাওয়ার ভাবনা ঘুরে ঘুরে এসেছে। কিন্তু একা একা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভ্যাসটাই যে সেভাবে তৈরি হয় নি সুদীপার। আলোকলতার মতো জীবনযাপন করেন নি ঠিকই, তাহলেও বিয়ের পর থেকে রজতাভর ভাবনাচিন্তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ইকনমিকস অনার্সের পরে এম এ পড়তে পড়তে বিয়ে এবং ইংল্যান্ড চলে আসা। কাজও করেছেন এদেশের কাউন্সিলে। ইচ্ছে করলে ধরেও রাখতে পারতেন। কিন্তু রঞ্জনা হওয়ার পরে রজতাভও চাননি, আর নিজেরও মনে হয়েছিল — সংসার দেখাটা ছোট কাজ নয়। সুখী পরিবার হিসেবে প্রবাসী বাঙালিদের কাছে পরিচিতিটাও হয়তো সেই কারণে। পরে আর কাজে ফেরেননি। মেয়ের কথা শুনে বললেন, রিল্যাকসড হতে পারব কি না জানি না। তবে কলকাতা যাওয়ার কথা মনে এসেছে।

রিল্যাকসড হতে পারবে না কেন মা ?

তোকে বোঝানোর অসুবিধে আছে। সব থেকেও কিছু না থাকার ফিলিংস টা তুই বুঝবি না।

বোঝাবার চেষ্টা করে দ্যাখো . . . . মে বি আমি . . . .।

এখনও আমার সেই এনার্জিটা নেই রে মা। ধাতস্থ হতে সময় লাগবে।

হোয়াট ! কী হতে সময় লাগবে ?

একটু সময় নিলেন সুদীপা। তারপর বললেন, মনটাকে একটু বশে না আনলে . . . কোনো ডিসিশনই নিতে পারব না।

দ্যাটস ভেরি ট্রু। তোমার কাছে বাবার এ্যাবসেন্সের ভ্যাকুয়াম এখনও অনেক খানি।

সেটা আমার কোনোদিনই যাবে না।

কিন্তু তার মধ্যেই তোমাকে লুক আফটার করতে হবে অনেককিছু . . . . তোমার ডাবল্‌ রেস্পনসিবিলিটিজ এখন — মা। সারাক্ষণ সেইসবই তো মাথায় ঘুরছে . . . ।

খোলা দরজার কাছে পায়ের শব্দ, মুখ ঘোরালেন সুদীপা। সুরূপা।

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বলল, গলা পেয়েই বুঝেছি — মা-মেয়েতে কথা হচ্ছে। আজ তো তোর ফেরার দিন মুনিয়া ? পরিবারের মধ্যে সবাই রঞ্জনাকে ছোট্ট থেকে মুনিয়া বলে ডাকে। মাসির গলা পেয়ে শোওয়া থেকে বাবা-মার বিছানায় উঠে বসল রঞ্জনা। তিন বোন সুদীপারা। তাঁর ওপরে সুতপা, মাঝখানে নিজে এবং পরে ছোটবোন সুরূপা। নাহ্‌ কোনো ভাই নেই সুদীপাদের। তাই নিয়ে অবশ্য খেদ ছিলনা সংসারে। সুদীপার প্রয়াত পিতৃদেব অমলেন্দু বলতেন, একটি নয়, দুটি নয়, তিন-তিনজন লক্ষ্মী আমার সংসারে। অনেকটা সেরকমই ছিল তাঁর পারিবারিক অবস্থাও। সচ্ছল, শান্তিপূর্ণ। সুদীপা ডাকলেন বোনকে। আয় দীপা, ভেতরে আয় না।

রঞ্জনা বলল, হ্যাঁ মাসি . . . . আজ ফিরবো। এবার না গেলে য়্যুনিভার্সিটি নাম কেটে দেবে। সামান্য আদুরে গলায় আবার বলল, এসে বোসো না গো, একটু গল্প করি। আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে . . . . !

সুরূপা বসতে বসতে বলল, এরমধ্যে আর আসবি না ? আমরা তো আছি আরও দু-সপ্তা।

হবে না মাসি . . . . য়্যুনিভার্সিটি এ্যালাউ করবে না।

তাহলে শীতের সময় দেখা হবে। দিদিভাই তো ডিসেম্বরে যাবেই।

দুই দিদিকে দুরকম নামে ডাকে সুরূপা। বড় সুতপাকে সোনাদি। সুদীপাকে দিদিভাই। সুদীপাও অবশ্য বড় বোনকে সোনাদি নামে ডাকতেই অভ্যস্ত। সেই অনুযায়ী ছেলেমেয়েরা সোনামাসি। সুরূপাকে সবাই শুধু মাসি বলে। মাসির কথা শুনে রঞ্জনা বলল, আর য়্যু শিওর ! মা তোমাকে কনফার্ম করেছে ডিসেম্বরে যাবে ?

উত্তর দিলেন সুদীপা। — টিকিট না-কাটা পর্যন্ত কি কনফার্ম করা যায় . . . . তবে যাব বলেই তো ভাবছি . . . যেতে হবে। দ্যাটস সুপার্ব। সেকথাই আমি মাকে বলছিলাম মাসি।

প্রথম কথাটা বেশ উৎসাহ নিয়ে বললেও, রঞ্জনার গলাটা স্তিমিত শোনালো পরের বার। বলল, কিন্তু তখনও আমার যাওয়া হবে না মাসি।

কেন ? তখন তো ক্রিসমাসের ছুটি তোদের।

জাস্ট ফর টু উইকস মাসি। নেকসট্ ইয়ারে ফাইনাল . . . . ভাল রেজাল্ট না হলে পোষ্টগ্র্যাজুয়েটে চান্স পাবো না। গলার সুর পালটে বলল, বাট মা মাষ্ট গো . . . . শি নিডস্ আ চেঞ্জ . . . . বলো ঠিক কি না ?

সুরূপা বলল, সে কথা তো আমি এসে পর্যন্ত তোর মাকে বলছি . . . . বোঝাচ্ছি। এতো বড় একটা ডিজাস্টার হয়ে যাবে কারুর তো মাথায় আসে নি। কিন্তু না হলেও এবার দিদিভাইয়ের কলকাতা যেতেই হতো।

রঞ্জনা বলল, হ্যাঁ, মা আমাকে সেই কথাই বলছিল। বাপী ঠিক করেছিল রাজস্থান আর গুজরাট যাবে।

সে তো ঠিকই ছিল . . . . হল না। সুরূপা বলল। কিন্তু তা সত্বেও দিদিভাইয়ের একবার যাওয়া দরকার। সুরূপার কথাতেই যেন একটা প্রয়োজনের বার্তা ছিল। রঞ্জনা বলল, এনিথিং আর্জেন্ট মাসি ? আর্জেন্ট না-হলেও . . . . দরকারি। আমাদের বাড়িটা তো জানিস — তিনটে ফ্লোর আমাদের তিন বোনের নামে লিখে দিয়ে গেছে বাবা। সেইগুলোই সব কর্পোরেশন থেকে অফিসিয়াল করার দরকার। একা মা আর ওসব দেখতে পারে না। কিছুটা অনিশ্চয়তার মাথা নাড়াল রঞ্জনা — যার অর্থ, খানিকটা বুঝল, আবার কিছুটা বুঝল না। মুখে বলল, দ্যাটস রাইট মা-র প্রপার্টি শর্টআউট করারও দরকার আছে।

সুদীপা বিছানা ছেড়ে নেমে পড়লেন। — আচ্ছা চল এবার .... নীচে যেতে হবে। ওরাও হয়তো উঠে পড়েছে এতক্ষণে।

সুরূপা তারপরেও মনে করানর মতো বলল, কলকাতা যাওয়ার টিকিটটা কেটে ফ্যালো দিদিভাই ... ফেলে রেখো না। বাড়ির ব্যাপারটা এবারেই মিটিয়ে নিতে হবে।

বসে আর গল্প করা হল না। মা, মাসি সহ নীচে নেমে গেল রঞ্জনাও। পিসিরাও রয়েছে তো!

(৩)

বছরের এই সময়টাকে রজতাভ বলতেন ফুলের দ্বিতীয় ঋতু। কাব্য করেই বলতেন। মাঝে মাঝে কাব্য করার শখ হতো ডাক্তারবাবুর। গলায় সুর ছিল না, তা সত্বেও কাব্য করার ইচ্ছাপূরণ করতেন বেসুরো গলায় রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে উঠে। শরৎকাল খুব পছন্দ ছিল। ভাল আবহাওয়া, নীল আকাশ দেখলে ঘুম থেকে উঠে খুট খাট করতে আপন মনে গাইতেন, ‘‘অমন ধবল পালে লেগেছে ... কিংবা শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি ...’’

নিজেই বলতেন, কে বলে এদেশে পুজো পুজো ভাব হয় না .... শরৎকাল টের পাওয়া যায় না! বরং কলকাতাতেই ইদানীং আর দুর্গা পুজোর আবহাওয়া বোঝা যায় না। ধূলো-ধোঁয়া-গরম, নীল আকাশ ঘোলাটে, মরফুটে শিউলি ... কাশফুল তো গ্রামগঞ্জে ছাড়া ফোটেই না ... রাস্তায়-রাস্তায় পিচ্ ঢেলে তাপ্পি মারার কাজ, প্রতিদিন মিছিল ....। আসল শরৎকাল তো এদেশেই ....। হাওয়ায় হিমেলভাব, আকাশে তো মনে হয় খড়ি দিয়ে দাগ দেওয়া যায় .... মেঘেরা দেশান্তরী ... আর এতো সুন্দর ধবধবে সাদা কাশফুল ফুটতেই কি দেখেছি দেশে ...! শুধু ঢাকের আওয়াজটাই যা গুমগুমিয়ে ওঠে না ....।

সুদীপা টুকটাক হাতের কাজ সারতেন। শুনতেন সব, বলতেন কম।

রজতাভ বলে যেতেন, আর এই যে গাছে-গাছে পাতাবাহার .... হলুদ-লাল-বাদামি .... এ তো আর এক বসন্তকাল, ফুলের দ্বিতীয় ঋতু! জানি, ঝরার সময় আসছে .... তাহলেও দেশটাকে তো দিয়েছে .... আমার বাবা পুজোর গ্যাঞ্জামের সময় মোটেও কলকাতা যেতে ইচ্ছে করে না .... জিনিসপত্রের আগুন দাম, ভ্যাপসা গরম, রাস্তাঘাটে ভিড়, চাঁদার জুলুম ... আর পুজোর কটা দিনতো বাড়ি ছেড়ে বেরুবারই প্রশ্ন ওঠেনা ....। প্যান্ডেলের এক মাইল আগে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেবে।

সুদীপা হয়তো অনেকক্ষণ শুনতে শুনতে একটা মন্তব্য করতেন। — আসলে তুমি বুড়ো হচ্ছো।

রজতাভ হাসতেন, কিছু মনে করতেন না। বলতেন, তা হচ্ছি। কিন্তু কথাগুলো যা বলছি মিথ্যে না।

কিন্তু দেশে লোকে ওইসবের মধ্যেই পুজো এনজয় করে।

কতটা এনজয়মেন্ট আর কতটা পানিশমেন্ট আমার সন্দেহ আছে।

ওই তো .... বুড়োরা সব ব্যাপারেই আগে পানিশমেন্ট দ্যাখে।

তা হতে পারে বাবা .... তবে আমি এখানে নিউক্যাসেল-এর পুজোই বেশ এনজয় করি। ষষ্ঠীর দিন থেকেই খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা। একটু আগে থেকে হাসপাতালের অনকল-টা ম্যানেজ করে নিতে পারলেই ...।

সুদীপা বলেন, তোমরা এনজয় করো বটে .... কিন্তু আমাদের কয়েকজনের বেশ ধকল যায়।

সে তোমরা কমিটির মেম্বার বলে। আস্তে আস্তে ইয়াংদের হাতে ছেড়ে দাও।

বলা সহজ। ইয়াংরা ঢুকেই সব ম্যানেজ করতে পারবে ! তাছাড়া এদেশে আর ইয়াং মেয়েরা আসছে কোথায় . . . যাদেরই সুযোগ আছে . . . . তারা সব আমেরিকা ছুটছে।

রজতাভ বলতেন, তা অবশ্য ঠিক। ইনিশিয়ালি বরেরা যেখানে জব পাবে . . . . বউয়েরাও সেখানেই যাবে। এটুকুর সঙ্গে সামান্য রসিকতা জুড়ে দিয়ে বলতেন, অবশ্য তুমি তো এখনও ইয়াং-ই আছো বেশ . . . .।

ঠাট্টা করছো নাকি ? হাফসেঞ্চুরি হয়ে গেছি।

তো কি হয়েছে ? দ্যাখো না . . . . হলিউড-এর গোল্ডি হন্ ষাট বছর বয়েসেও কেমন কাঁপিয়ে দিচ্ছে . . .।

কথাগুলো খুব মনে পড়ছে সুদীপার।

পুজো এবছর দেরিতে পড়েছে। তাও অক্টোবরের আর কটা দিনই বা বাকি। আঠাশ তারিখেই বোধহয় মহাষষ্ঠী। আজ একুশ তারিখ হয়ে গেল। মনে আছে জুন মাসের পুজোমিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন সুদীপা-রজতাভ। যথারীতি এবছরেও কমিটি মেম্বার হিসাবে তাঁর নাম আছে। অন্যান্যবার হলে এরমধ্যে কতবার কোলাকুলি-ডাকাডাকি হতো। এ বছরে সবাই চুপচাপ হয়ে গেছে রজতাভর আকস্মিক প্রয়াণের পরেই।

সুদীপা শুনেছেন, কমিটির সম্পাদক মধুশ্রী মুখার্জিই নাকি বলেছে, পুজো-টুজোর কাজে এবার তো আর দীপাকে ডাকা যাবে না . . . . ভোগ রান্নাটাও এয়োস্ত্রীদের করার কথা . . .। ওকে না হয় পরিবেশনের কাজে রাখো যদি আসে . . . .। উইডো হওয়া ছাড়া এ বছরটা তো ওদের কালাশৌচও পালন করতে হবে। শুভকাজে ইনভলভ্ না-করাই ভাল। শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সুদীপা।

চোদ্দ-পনের বছর ধরে বেঙ্গলি এ্যাসোসিয়েশনের দুর্গোৎসবকে যাঁরা দাঁড় করালেন, তাঁদেরই এক সদস্যের অকালমৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে এই মন্তব্য ? রজতাভর প্রয়াণে বিধবা সুদীপা . . . . অশুভ, ব্রাত্য হয়ে গেলেন পুজোকমিটির কাছে ?

না — পুজো কমিটির কাছে না, এবং ওই সিদ্ধান্তও পুজোকমিটির নয়।

বাঙালিদের প্রতিষ্ঠান হলেও, প্রবাসী বাঙালিদের নীচতা এই পর্যায়ে নামবে বলে সুদীপা বিশ্বাস করেন না। নিজেদের মধ্যে দল-পাকানো, রেষারিষি, পরশ্রীকাতরতা, হাম্বড়াই ভাব . . . ইত্যাদি থাকলেও, একটি প্রাণোচ্ছল মানুষের মর্মান্তিক প্রয়াণের পরে, সাধারণ বঙ্গসন্তানরা আর হৃদয়হীন হয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকেন না। সহানুভূতির আবেগে আপ্লুত হন নিজেরাই।

কিন্তু অ-সাধারণ, বিশেষ করে প্রতিশোধস্পৃহ দুই-একজন মহিলা থাকেন বৈকি ! মধুশ্রীকে সুদীপা চেনেন অন্তত পঁচিশ বছর। জানেন ফর্সা, ঢ্যাঙ্গা মহিলাটি বরাবরই চূড়ান্ত হীনমান্যতার শিকার। মুখে মিছরির ছুরি। ওপর ওপর আবেগে ভেসে গেলেও, বরাবর একটি কূট কুচুটে ঈর্ষাকাতর মন ক্রিয়াশীল থাকে ভেতরে গোপনে। মাঙ্গলিক ক্রিয়া-কর্মের ধ্বজাধারী বলে নিজেকে জাহির করেন মধুশ্রী, আসলে সবটাই ভড়ং আর লোকদেখানো। কিন্তু সুদীপাকে তিনি সহ্য করতে পারেন না অন্য কারণে। সম্ভবত তাঁর মিশুকে স্বভাব, সুন্দর চেহারা আর সপ্রতিভ আচরণের কাছে মধুশ্রী বারবারই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েন অন্যদের কাছে। ঈর্ষার ক্ষরণে প্রায়শই বেসামাল হয়ে পড়েন মধুশ্রী মুখার্জি।

কিন্তু এতখানি নীচতার প্রকাশ সুদীপা কল্পনা করেন নি। যাকগে। মধুশ্রীকে ক্ষমাঘেন্না করে দেবেন তিনি। বাড়ির পিছনদিকে উত্তরপশ্চিমের কমজারভেটারিতে বসেছিলেন সুদীপা। একা। মাত্র একদিকের দেয়াল ব্যতিত ছাদসহ বাকি তিনদিক স্বচ্ছ ফাইবার গ্লাসের আবরণে ঘেরা। বিকেল পড়ে আসছে। দীর্ঘ দিন সংকুচিত হতে হতে এবার আঁধারের

আধিপত্যে নিঃশ্ব, করুণ মুখ লুকোবে প্রকৃতি । এখনও অবশ্য আলো আছে । রঙীন গাছের পাতা পড়ন্ত সূর্যের লালিমায় ঝলমল । আকাশে গভীর নীলের সঙ্গে বুঝি কিঞ্চিৎ মেশামিশি । পাখিরা দল বেঁধে ঘরে ফিরছে । গেরুয়া মায়া আলোয় নিস্তেজ আভা । কোথাও একটা চোরা বিষাদের অনুভব চারিয়ে যাচ্ছে সুদীপার বুকের মধ্যে । জমাট বাঁধতে চাইছে একাকীত্ব ।

নাহ্ শুধু মধুশ্রীর মন্তব্য শোনার পর থেকেই না । খারাপ লেগেছে, কষ্ট পেয়েছেন ঠিকই । তাহলেও অমন একটি পরশ্রীকাতর মহিলার সার্বিক ভূমিকাকেই তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং এড়িয়ে যাওয়ার মতো মানসিক দৃঢ়তা তাঁর আছে । এমনিতেই পুজোর ব্যাপারে কোনরকম ভাবে আর জড়ানর উৎসাহ তো দূরের কথা, ভাবনাটাই তো আসছে না । আদৌ যাবেন কিনা সুদীপা জানেন না । হাজারটা অন্য ভাবনাচিন্তার নিরন্তর টানাপোড়েনে দীর্ণ হচ্ছেন একা, অহরহ । সিদ্ধান্তহীনতার দোলাচলে ভাসছেন সুদীপা ।

শেষ পর্যন্ত বাড়ি খালি হয়ে গেছে আজ চারদিন । দেখতে দেখতে ছটি সপ্তাহ অতিক্রান্ত হয় রজতাভ চলে যাওয়ার পরে । অথচ এবার, এখনই যেন বাড়ির সর্বত্র, আনাচে কানাচে মানুষটার উপস্থিতি আরও তীব্র হয়ে উঠেছে সুদীপার কাছে । নিজেদের শোওয়ার ঘরে, বাথরুমে, কিচেন, ড্রইংরুম-ইউটিলিটি-গ্যারাজ এমনকি এই কনজারভেটারিতেও । রজতাভর অনুপস্থিতির প্রভাব বাগানেও । ঘাস কাটা হয় নি আজ কতদিন ! আপেল-চেরি-প্লাম গাছগুলোর ডাল ছেঁটে দেওয়ার সময় হয়েছে । কিচ্ছু করা হয়নি । সব উলো ঝুলো । পড়ে আছে । ঘরকুটে আগাছা সীমানা পাঁচিলের গায়ে . . . . মনে পড়ায় . . . যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' . . . . ।

ননদ জয়া আর তাঁর কন্যা দেবযানী, প্রায় রঞ্জনারই বয়সী, য়্যুরোপ কন্টিনেন্ট – এ বেড়াতে চলে গেছে – রঞ্জনা ফিরে যাওয়ার পরের দিন । স্যুইজারল্যান্ড-প্যারিস-ফ্র্যাংফর্ট ঘুরে ওরা আবার ফিরে আসবে । সুদীপার কাছে না । সানডারল্যান্ডে, দাদার বাড়িতে । স্কটল্যান্ড দেখে ফিরবে । পুজো কাটাবে লন্ডনে, স্বামীর কোনো আত্মীয়র বাড়িতে ।

সুরূপা – চঞ্চল ছিল তারপরেও কটা দিন ।

নানান ব্যবহারিক আর অফিসিয়াল কাজে গাড়িতে ওদের সঙ্গে নিয়েই ছোটাছুটি করছিলেন সুদীপা । ভরসাও পাচ্ছিলেন কেউ একটা সঙ্গে থাকায় । না, ঠিক 'ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো'-র মতো না । বোন-ভগ্নীপতি দুজনেই ছিল বড় আন্তরিক । বলার জন্য অপেক্ষা করে নি । স্বেচ্ছায়, নিজেদের উদ্যোগে দিদির এটা সেটা দায়ভার কাঁধে নিচ্ছিল । আলোচনা করছিল, সব বিনিময় করছিল, পরামর্শ দিচ্ছিল, সতর্ক করছিল । আজ ওদের অনুপস্থিতিতে আরও নিঝুম বাড়ি । সিদ্ধান্তের কিনার ঘেঁসে যেসব আলোচনাগুলো সন্ধেবেলায় অবসাদকে ঠেকিয়ে রাখতো, আজ নৈঃশব্দ্যের বাতায়নে আবার যেন ধেয়ে আসছে । ফিরে আসছে সেগুলো ।

এখনও বড় তীব্র, স্পষ্ট, উষ্ণ রজতাভর যা কিছু . . . সামগ্রিক উপস্থিতি । তাকে সরিয়ে, সহনশীল করে নিয়ে, জীবনযাপনের ভাবনা – দায়-উদ্দেশ্য- প্রয়োজনীয়তার নিরিখে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়াই সহজ না । তবু কথা হতো ওদের সঙ্গে । চঞ্চল সব আলোচনায় অংশগ্রহণ করার পরেও বলতো, আরও ভাবতে হবে দিদি ।

সুদীপা বলতেন, জানি । এলোমেলো ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় বলতেন, ভাবনাটাকে গোছ করাই বড় কাজ । কেবলই একটার ঘাড়ে একটা এসে পড়ে । কনসেন্ট্রেট করতে পারি না ।

আমাদের সকলেরই এক সমস্যা দিদি । চঞ্চল বলে, ভাবানার স্রোত একমুখী করে তোলা সহজ কাজ নয় এমনিতেই । তোমার তো তার ওপর ভাবনার বিষয় ও এতোগুলো ।

সুরূপা সামান্য অসহিষ্ণু । স্বামীর কথার মধ্যে বলে, হলেও . . . . তারমধ্যে থেকে একটা একটা করে পিকআপ করতে হবে তো ! সুদীপা বলেন, দ্যাখ না, সেই চেষ্টা করতে গিয়েই দেখি একটার সঙ্গে আর একটা জড়ানো । কোনোটাকেই যেন আলাদা করা যায় না । তা তো হবেই দিদি ।

সেই জন্যই তো একটা ব্যাপারে ডিসিশন নিতে গেলে, আর একটা পথ জুড়ে দাঁড়ায়।

তারমধ্যেই প্রাইওরিটি বিচার করতে হবে।

ও চলে যাওয়ার পর থেকেই তো সেই ভাবনা ঘুরে ঘুরে আসছে। কোনটা বেশি ইম্পর্টান্ট।

চঞ্চল তখনই বলল, কী জানো দিদি, আমাদের কালচার, ভাবনাচিন্তা যেরকম, তারমধ্যে আবেগ আর বাস্তবতার মেশামিশি এমনিতেই খুব বেশি। তার ওপর তোমার প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে এই আকস্মিক ইন্দ্রপতন . . . .। ভাবব বললেই ভাবা যায় না।

সুদীপা মাথা দুলিয়ে বললেন, এখনও পর্যন্ত সবই যেন ঘোলাটে হয়ে রয়েছে। তাছাড়া এতো অব্‌সেসড হয়ে রয়েছি . . .। হবেই তো। আমি তো দেখেছি, রজতদার এমন একটা সুদিং ইনফ্লুয়েন্স ছিল তোমার ওপর।

ও আসলে কিছুই জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার লোক ছিল না।

সেটাই তো হাজব্যান্ড হিসেবে নজর কাড়ার বড় কোয়ালিটি।

আবার তার মানে যে সব ছেড়ে উদাসীন হয়ে থাকতো, তাও না।

সে তো বটেই দিদি। চঞ্চল বলল, কী জানো . . . আমার মনে হয়, কর্মব্যস্ত এবং দিলখোলা স্বামীরা শেষপর্যন্ত ঘর-সংসারের নানান ব্যাপারেই উদাসীন হতে শুরু করে বউ এর সঙ্গে বিতর্ক আর আকচাআকচি এড়ানোর জন্য। বলার কথাও কখনও এড়িয়ে যায়। সুরূপা সঠিক সময়েই তখন মন্তব্য করেছিল, এই যে শোনো চঞ্চল দত্ত . . . আমিও কিন্তু আছি এখানে।

চঞ্চল হেসেই বলেছিল, তাতে কী ? কথাটা মিথ্যে বললাম ?

সুরূপা ভুরু কুঁচকে বলল, মনে হল যেন . . . কথাটা আমার দিকে তাকিয়ে বললে !

একে বলে, ঠাকুর ঘরে কেরে . . . আমি তো কলা খাই নি !

তার মানে কী ? আমি তোমার সঙ্গে সবসময় বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছি ? নাকি তোমার সাজেশন শুনি না।

নারে বাবা . . . তোমার আমার কথা হচ্ছে না। দিস ইস আ জেনারাল স্টেটমেন্ট।

সুরূপা তারপরেও বলল, তবে তুমি সাংসারিক ব্যাপারে কিন্তু বেশ উদাসীন আছো।

চঞ্চল বলল, না দিদিমনি . . . উদাসীন নই . . . ওটাকে বলে নির্ভরশীলতা কিংবা গৃহকর্ত্রীর ওপর বিশ্বাস। দিদিকে যেটা বলছিলাম – রজতদার-ও তাই ছিল। জোর করতেন না, আবার দরকারের সময় এগিয়ে আসতেন। মতামত দিতেন।

একেবারে ঠিক বলেছো চঞ্চল, সুদীপা বললেন। আজ সেই কারনেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আমার এই বার বার অগ্রপশ্চাৎ ভাবনা . . . সেটাই ভাবছি, মনে হচ্ছে ঠিক হচ্ছে তো ? লোকটার ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়াই . . . . কিন্তু কোথায় সে ?

ওভাবেই সঠিক ভাবনাটা আসছে দিদি। চঞ্চল বলল। পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলবে . . . তারপর সিদ্ধান্ত নেবে নিজে। একটু নীরবতা রচিত হয়েছিল। বার্চভিউ ক্লোজের বাইরে আঁধার। ভিতরে আলোকিত ড্রইংরুমের মধ্যে তিনজনের কথোপকথন চলছিল বলেই বড় টিভিটা অন থাকা সত্ত্বেও শব্দহীন করে রাখা ছিল। একটা-দুটো টেলিফোন ছাড়া এখন আর

কারুর আসারও কথা না। নেহাৎ সুনন্দন আর বিদিশা অবশ্য যখন তখন আসতেই পারেন। কিন্তু ওঁরাও জানেন সুদীপার বোন-ভগ্নীপতি এখনও আছেন।

একটু যেন ভাববার পরে সুরূপা বলল, তবে আমি তোমাকে প্র্যাকটিক্যাল হতে বলব দিদি।

চিন্তাচ্ছন্ন মাথা দোলালেন সুদীপা। সে তো বটেই।

শুনতে যেমনই লাগুক দিদি.... স্মৃতি নিয়ে জীবন কাটবে না।

কী দিয়ে কাটাব তাই মাথায় ঘুরছে সবসময়।

চঞ্চল বলল, ইট ইন এ ফেজ অব বিউইল্ডারমেন্ট ... সব ব্যাপারটাই এতো আকস্মিক ... দিদির কোনো মেন্টাল প্রিপারেশন ছিল না। রজতদা হয়তো অসুখে ভোগার কষ্ট পান নি কিন্তু দিদির পথে এই সিচুয়েশনে কোপ করা শক্ত বৈকি!

সেই জন্যেই তো দিদিকে একটা ফার্ম ডিসিশন নিতে হবে এখন। সুরূপার গলায় অসহিষ্ণুতা চাপা থাকছে না। ঝপ্ করে সোফার ওপর পা গুটিয়ে বসেছে। বলল, রবিন কিংবা মুনিয়ার সঙ্গে তোমার জীবন ট্যাগ করে রেখে লাভ নেই দিদি। জানি তো। সেকথা বারবারই আমার মাথায় এসেছে। সুদীপা বললেন। কিন্তু একেবারে ওদের ছেড়েই বা থাকব কি করে বল? বিশেষ করে মুনিয়া তো নিজের জীবন শুরুই করেনি এখনও।

ছেড়েই বা থাকবে কেন? এখন যেরকম আছো, তেমনই থাকবে। কিন্তু আমি বলছি, ওদের ভাবনা ভাবতে গিয়ে তুমি নিজের স্বাধীনতা খুইও না। জীবনটাকে রেস্ট্রিক্ট করে ফেলো না।

সে তো বটেই রে। ওরাও কখনও আমাকে সেকথা বলবে না।

আমি তোমাকে আগেও বলেছি দিদি আবারও বলছি, কলকাতায় ফিরে গিয়ে থাকার অপশনটা তুমি আবারও ভাল করে চিন্তা করো। শত হোক তোমার নিজের দেশ। নিজের বাড়িও তোমার আছে। আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব-পরিচিত কম নেই। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে নিজের কালচার...।

সুদীপা বললেন, বাড়িঘর-আত্মীয়স্বজন ওসব নিয়ে আমি ভাবছি না। বিশেষ করে আরও মা এখনো বেঁচে আছে বলেই আমারও একটা টান রয়েছে। আবার আমাদেরও বাড়ির প্রপার্টিও রয়েছে। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। এতো বছর এদেশে থাকার অভ্যাস কাটিয়ে আবার পারব তো?

না পারার কি আছে দিদি? মানুষ অভ্যাসের দাস। তার ওপর নিজের দেশই তো। কিন্তু সেগুলোও আসল না... আসল হচ্ছে, এই নিঃসঙ্গতা, এই ঠান্ডা, নির্জনতা, আপনজনহীন অবস্থা থেকে মুক্তি। যাদের সঙ্গে একদিন জীবন কাটিয়েছো, যে পরিবেশে বড় হয়েছো সেই সব কিছু কে আবার পাশে পাবে। আজ কি সেটাই তোমার সব থেকে বেশি প্রয়োজন নয়?

মাথা নাড়তে নাড়তে ঝুম হয়ে রইলেন সুদীপা। নিঃশব্দ টিভি স্ক্রিনে খড়ির দাগ দিয়ে একটা প্লেন আকাশ পার হচ্ছে। একটু রেড ওয়াইন খাচ্ছিল চঞ্চল। স্বগতোক্তির মতো মন্তব্য করল, ভাবতে হবে... ভাবতে হবে।

সেই ধারাবাহিক ভাবনা থেকে সুদীপার রেহাই পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না এখনই। সুরূপার ফিরে যাওয়ার পরেও ভেবেই চলেছেন।

কিন্তু শাখা প্রশাখা যে ছড়িয়েই যাচ্ছে। একটা ভাবনার ডাল ধরে খানিকটা এগিয়ে যান.... তারপরেই দেখেন, নানান যুক্তি আর প্রশ্ন যেন সরু সরু প্রশাখার মতো বেরুতে বেরুতে আসল মোটা ডালটাকেই পলকা করে দিচ্ছে।

দেশে ফিরবেন, নাকি ফিরে যাবেন না, এখন ও তাই নিয়ে যথেষ্ট ভাবনার টানা পোড়েন থাকলেও, মাথায় রাখাটা যে জরুরী, সুদীপা খুব ভালভাবেই সেটা টের পান। রূপাটা ফিরে যাওয়ার পরে বিগত কয়েকদিন ধরে সেটা আরও ভাল করে বুঝতে পারছেন। একা মানুষের পক্ষে ইংল্যান্ডের মতো দেশে জীবনযাপন করে যে কতখানি দুরূহ, কষ্টকর, তা এদেশের বয়স্ক মানুষদের দেখলেই বোঝা যায়। সেক্ষেত্রে প্রবাসী এবং বঙ্গসন্তান, যারা কখনই এ দেশের মূলস্রোত এবং সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি, তাঁদের সঙ্কট আরও কত গভীর, পীড়াদায়ক হতে পারে, সহজেই অনুমেয়।

একা বয়স্ক মানুষদের দেখাশোনার জন্য সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগ আছে। সভ্য দেশ হিসেবে নাগরিকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে সুদীপা নিজেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। একসময় অনেকবছর আগে যখন কাউন্সিলে চাকরি করতেন, তখন নিজেদের শহরের সবকটা কেয়ারহোম-এর দেখভাল সম্পর্কিত নথিপত্র সুদীপাকে দেখতে হতো। বয়স্ক এবং একা মানুষরা সেখানে কিভাবে জীবনযাপন করেন, সে সম্পর্কে তাঁর ভালই ধারণা আছে।

মনে মনে জানেন সুদীপা, নিশ্চয়ই এখনও অনেকদিন তাঁর কেয়ার হোমে গিয়ে থাকার অবস্থা হবে না। তা সত্বেও ভবিষ্যতের ভাবনা যেন অজান্তেই মনের দখল নেয়। কিন্তু তার চেয়েও যা বেশি মনে আসে এখনই, তা হচ্ছে এই স্তব্ধ একাকীত্ব, নিশ্ছিদ্র নীরবতা, নিঃসঙ্গতা। কথা বলার মানুষের অভাব। হুট বলতে কোথাও বেরিয়ে যেতে না পারা।

নাহ্ জীবনযাপনের অনেক সুবিধে, স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও এই ভূতের মতো একা বসে থাকার জীবন কাটাতে পারবেন না সুদীপা। কাঁহাতক টিভি দেখবেন ! কতক্ষণই বা সময় যায় একা মানুষের সংসার দেখতে ! কতই বা কাজ !

হ্যাঁ এদেশেও বন্ধুবান্ধব, চেনাপরিচিতি কিছু কম নেই তাঁদের। যাতায়াত-যোগাযোগও আছে। কিন্তু সে সবই সামাজিক, সাপ্তাহিক, অনুষ্ঠানিক যোগাযোগ। নিত্য নিয়মিত কিছু না। সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোর একঘেয়েমি কাটানর আর এক উপায় – সুলভ দূরভাষিক আলাপচারিতা। কিন্তু সংসারিক মানুষদের তারজন্য সময় বার করাটার খুব সহজ নয়। বাইরে কাজ না-করা গৃহবধূকে এদেশে দশভূজা হতেই হয়; সংসারে জুতো সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ আর করে কে !

আর সুদীপার অধিকাংশ এদেশের পরিচিত বন্ধুরাই তো এখনও ঘোরতর সংসারী। ছেলেমেয়ে, স্বামী, কিছু কিছু ক্ষেত্রে জামাই বা পুত্রবধূ নিয়ে তাদের দম ফেলারই সময় নেই। কে টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে বকর বকর করবে ! একমাত্র সন্ধের দিকেই তাদের যেটুকু ফুরসৎ এবং তাও উইকেন্ড এ। টেলিফোন করার সময় পায় না ছেলেমেয়েরাও। কারুর বিয়ে-থাওয়ার ও কথা ওঠেনি।

শরতের ক্লান্ত গোধূলির বিষন্নতা চারিয়ে যেতে থাকে সুদীপার মাথার মধ্যে। ব্যতিক্রমী হয়ে গেছে তাঁর পরিস্থিতি। নাহ্ কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রবাসী বাঙালি বলেই তাঁর আপনজনদের কাছে ফেরার একটা পথ খোলা আছে। আর আছেই যখন, তা কাজে লাগাবার চেষ্টা করে দেখতেই বা ক্ষতি কী ! কিন্তু কাজ রয়েছে তার আগেও।

কনজারভেটরি থেকে উঠে আসেন সুদীপা।

মনে পড়ে যায়, রজতাভর পেন্সন এবং হাসপাতাল থেকে টাকাপয়সা সংক্রান্ত বিষয়ে পিটর্লির শুভঙ্কর পালের সঙ্গে কথা বলতে হবে। পালদা কয়েকদিন আগে নিজেই ফোন করে বলেছেন, হাসপাতালের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসই এ ব্যাপারে সব ঠিকঠাক করে দেয়। কিন্তু তোমাকেও দেখেশুনে, বুঝে নিতে হবে। সময়মতো ফোন কোরো একদিন। কিছু কিছু বিষয়ে অন্তত খানিকটা আন্দাজ দিয়ে দিতে পারব। তুমি নিজেও ফাইল-টাইল দ্যাখো।

টেলিফোনটা করতে গিয়েও দাঁড়াতে হল সুদীপাকে। ডিংডং বেল বেজেছে বাইরে থেকে।

ভিউ ফাইন্ডারে চোখ লাগিয়ে আগে দেখে নিলেন। সুনন্দন আর বিদিশা এসেছেন। মনটা খুশিই হল। সাধারণত আগে থেকে ফোন না করে কেউ আসেন না। সুনন্দনরা নেহাৎ পাড়ার লোক বলেই হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছেন।

গলা উঁচু করে সুদীপা বললেন, দাঁড়াও বিদিশা . . . খুলছি।

হাই মা . . . কী করছো ?

বিকেলবেলা রবিনের টেলিফোন পেয়ে একটু অবাক হলেন সুদীপা।

এসময়ে যে কোন কারুর টেলিফোনই কম আসে, নেহাৎ বিশেষ কোনো কাজের ব্যাপার ছাড়া। তা নয়তো উটকো কতকগুলো কোম্পানীর দালাল কিংবা ফাইনান্সিয়াল এ্যাডভাইসার ইত্যাদিরা উপকার করার ছলে বিরক্ত করে। এরকম কেউই ভেবেছিলেন সুদীপা। তা সত্ত্বেও চায়ের কাপটা রেখে হ্যান্ডসেট তুলে নিলেন।

ছেলের গলা পেয়ে অবাক ভাবটাই ঝরে পড়ল। — কীরে তুই ! এসময় ফোন করছিস যে ! কাজ নেই ? ছিল একটু আগে ফিরে এসেছি।

তার মানে ! কোথায় ?

কোথায় আবার . . . আমার ফ্ল্যাটে। আজ আমার হাফ ডে ছিল মা।

একটু ভাবলেন সুদীপা। রবিন-এর কাজে হাফ ডে থাকে বলে আগে শুনেছেন কিনা মনে পড়ল না। অবশ্য ওসব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনার সুযোগই বা কতটুকু হয়েছে আগে ! টুকটাক কথাবার্তা যা কিছু হতো সবই ওর বাবার সঙ্গে। রজতাভ নিজেও আইন ব্যবসা সংক্রান্ত কাজকর্মের বিষয়ে খুব একটা কিছু জানতেন না। ছেলে যা বোঝাতো তাই বুঝতেন সম্ভবত। কবে খোঁজখবর রাখতেন, ছেলে কোথায় কোন ফার্মে কাজ করে . . . কোথায় থাকে ইত্যাদি ।

রবিনের কথা শুনে সুদীপা বললেন, ওহ্ তাই বল ! তোদের কাজে যে হাফ ডে থাকে.. আমার জানা ছিল না।

জানবে কি করে? তোমার সাথে আমার তো কথাই হতো না মা।

তাইতো . . . . তোমরা দয়া করে টেলিফোন করলে . . . . তখনই যা যেটুকু . . . । তা নয়তো ফোন করলেও তো তোদের ধরা যায় না। সবসময়ই আনসারিং ফোন।

কিন্তু বাবার সঙ্গে আমার কথা হতো মা। বাবা সবই ডিটেল জানতো এ্যাবাউট মি . . . . আমি কোথায় . . . . ।

একটা শ্বাস পড়ে গেল সুদীপার। রবিনের কথাগুলো যেন হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। পূর্ণ অর্থ নিয়ে কিছুই মাথায় ঢুকছে না। মাস দুয়েক হয়ে গেছে রজতাভ চলে গেছেন। ব্যস্ত কাজের দেশে মানুষও যার যার কাজে — জীবন যাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমনকী রবিন-রঞ্জনাও বাবার কাজ হয়ে যাওয়ার পরে প্রথম প্রথম একসপ্তাহ — দুসপ্তাহ পরে বাড়িতে এসেছিল, একরাত দুরাত ছিল। আস্তে আস্তে সেটাও কমে গেছে। যাওয়াটাই স্বাভাবিক সুদীপা বোঝেন। রবিনের একটা পুরনো গাড়ি থাকলেও, রঞ্জনার এখনও গাড়ি নেই। তাছাড়া থাকলেও এতো দূর গাড়ি নিয়ে আসার ধকল আছে। সময় এবং খরচ সাপেক্ষও বটে। ট্রেনে যাতায়াত করাও খুব সহজ নয়। ভাড়াও খুব বেশি। রবিনের কথাতেই সম্বিত ফিরল সুদীপার।

মা . . . আর য়্যু মিশসিং টু মি ? শুনতে পাচ্ছো আমি কি বলছি ?

সুদীপা আমতা আমতা করলেন রিসিভারের সামনেই। হ্যাঁ-রবিন শুনছি . . . মানে, না-মনটা হঠাৎ . . . আসলে তোর কথা শুনতে শুনতেই একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম রে . . . আচ্ছা বল . . . কী বলছিলি যেন . . . ।

একটু চুপ করে থেকে রবিন বলল, ওকে মা . . . ডোন্ট ওয়ারি। আমি আবার পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। সুদীপা কিছুটা অস্বস্তিতেই যেন অধীর হলেন। বললেন, না না বল, বল। এবার আমি শুনছি . . . সরি তখন . . . ।

ঠিক আছে মা . . . সরি বলার কিছু হয় নি ।

আসলে বুঝিসই তো — মনটা তো এখন ও মানতে চায় না . . . মানুষটা নেই ।

জানি মা, জানি । তোমার সিচুয়েশনটাও বুঝতে পারি . . . বাট ইন দিস কান্ট্রি . . . আমিও এতো দূরে থাকি . . . ! হঠাৎ মনের কথাটাই ছেলেকে বলে ফেললেন সুদীপা । এর আগেও কয়েকবার হাবভাবে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অন্য প্রসঙ্গ এসে পড়েছে কথার পৃষ্ঠে । আসল কথাটা চাপা গেছে । এবার রবিনই যেন প্রসঙ্গটা এনে দিল । সুদীপা বললেন, আচ্ছা শোন রবিন, কথাটা তোকে আগেও বলার চেষ্টা করেছি . . ।

কোন কথাটা মা ?

(চলবে)

প্রখ্যাত সাহিত্যিক **নবকুমার বসু** ইংল্যান্ডের বাসিন্দা । ''চিরসখা'' সহ অনেক জনপ্রিয় উপন্যাস তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন । প্রতিভাস প্রকাশিত 'তোমার আঁধার তোমার আলো' তাঁর নবতম উপহার, গত বইমেলায় প্রকাশিত । 'হটাবাহার' তাঁর প্রথম অন্ লাইন ধারাবাহিক উপন্যাস, তিনি বাতায়নের হাতে তুলে দিয়েছেন ।

বাতায়ন বুলেটিন !

সেতুবন্ধন :

শুভেচ্ছা

সাহিত্যিক ও Techno India Group-এর কর্ণধার শ্রী সত্যম রায়চৌধুরী অভিনন্দন জানালেন "বাতায়ন"কে । সঙ্গে বাতায়নের বন্ধু শ্রী মিলন ভট্টাচার্য্য ।

জাদুর ছোঁয়া

জাদু সম্রাট পি সি সরকার (জুনিয়ার) -এর হাতের ছোঁয়ায় খুশির আমেজে "বাতায়ন"

অভিনন্দন

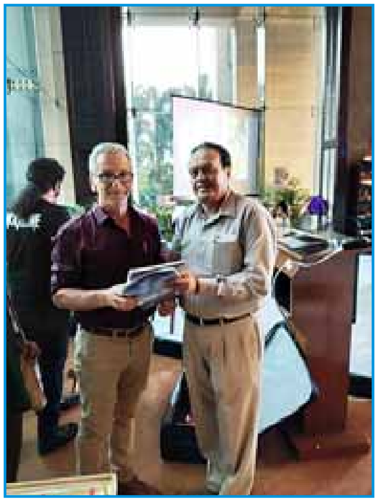

Appreciation from John Zubrzycki – Author of "Jadoowalla, Jugglers and Jinns" (New Statesman's — The best book of the year 2018)

স্মৃতিকথা

সিদ্ধার্থ দে

সুনীল সাগরে

পর্ব ২

(৫)

একবার রিচার্ড অ্যাটেনবরোকে এক সাক্ষাতকারে প্রশ্ন করা হয়েছিল – সত্যজিৎ যখন তাঁকে 'শতরঞ্জ কি খিলারী'তে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন তখন তাঁর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল। উত্তরটা ক্লাসিক – পন্ডিৎ ইংরেজ সাহেবরাই অমন কথা বলতে পারেন : "When Ray asks you to act in his film, you don't consider it over a cup of tea, you just say 'yes'! "

২০০০ সালের শেষ দিকে আমারও ঐ অবস্হা হয়েছিল। একটু বিস্তারিতভাবে ঘটনাটি লিখব – পাঠক ধৈর্য হারাবেন না আশাকরি।

আমার মায়ের সেই সময়ে দু দেশেই বাস। বছর খানেক ক্যানবেরাতে থেকে কিছুদিনের জন্য কলকাতায় ফিরছেন। লেডি ব্রেবোর্ণে পড়া উচ্চশিক্ষিতা মহিলা – চোস্ত ইংরিজি বলতে পারতেন, প্রথম দিকে একাই স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতেন। কিন্তু হালে ডিমেনশিয়ার প্রাথমিক লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, তাই সেদিন মায়ের ভ্রমণসঙ্গী হিসাবে ক্যানবেরার অগ্রজ বন্ধু পার্থ ভট্টাচার্য-র কন্যা রাকাকে পাওয়ায় কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

যাইহোক, পার্থদা আর আমি দুজনকে দুপুর নাগাদ সিডনি থেকে প্লেনে তুলে দিয়ে ফেরার উদ্যোগ করছি। দিনটা ছিল শনি বা রবিবার – মধ্য গ্রীষ্মের একটা ঝলমলে দারুণ দিন। পর্যটনের প্রসারের জন্য অস্ট্রেলিয় সরকার এমন দিনের ছবিই মেলে ধরেন।

ডিসেম্বর মাসে সুর্যাস্ত হয় রাত আটটারও পরে। তাই তড়িঘড়ি ক্যানবেরা ফেরার কোন প্রয়োজন ছিলনা। পার্থদার পরিচিত কিছু বন্ধুর তরফে সিডনির শহরতলির এক উদ্যানে পিকনিকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ ছিল। সেখানেই হাজির হলাম গিয়ে।

বছর দুয়েক সিডনিবাসের দরুন আমারও পরিচিত কিছু মানুষ পেয়ে গেলাম। কথায় কথায় শুনলাম, সিডনিতে নাকি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আসছেন। উদ্যোক্তা শ্রীমন্ত মুখোপাধ্যায় নামে এক ভদ্রলোক যিনি পিকনিকের জমায়েতে আছেন।

কালক্ষেপ না করে আলাপ করলাম। প্রথম সুযোগেই কথাটা পারলাম – ওঁকে কি ক্যানবেরাতে নিয়ে আসা সম্ভব ? শ্রীমন্তবাবু সাবেকি ব্যবসায়ীসুলভ নিস্পৃহ মুখে জানালেন, তা অসম্ভব নয়, তবে আমাদের কমপক্ষে এক হাজার ডলার দিতে হবে এই উদ্যোগের সমর্থনে।

সেই আমার অ্যাটেনবরো মূহুর্ত। ক্রিকেটে যেমন স্লিপে বা গালিতে ফিল্ডাররা হাফ চান্স লুফে নেন – আমিও কিছুমাত্র চিন্তা না করেই উত্তর দিলাম "সেটা কোন ব্যাপার নয় !"

আরও কিছু কথা হল তারপর। মোটামুটি একটা "agreement in principle" হল। একটা মধুর আবেশ নিয়ে ক্যানবেরা ফিরলাম। প্রহরশেষের আলোয় সেদিন সর্বনাশের চিহ্নমাত্র ছিল না। ছিল একটা অনাস্বাদিত আনন্দের পূর্বাভাস।

চন্দনা এমন এক শ্রেণীর মহিলা যাদের বয়স বাড়েনা। নীললোহিতের মহিলা সংস্করণ বলা যায়। কলকাতায় এই গোত্রীয় বহু মহিলা দেখা যায়। খবরটা শুনেই আগে আমাকে লাফাতে লাফাতে এসে জড়িয়ে ধরল।

দিনক্ষণের তখনও কোন ঠিক নেই, কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল সেই সন্ধ্যা থেকেই।

(৬)

এক হাজার ডলার জোগার করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। ক্যানবেরার গোটা কুড়ি পরিবারকে ফোন করেই তার চেয়ে কিছু বেশী অঙ্কের প্রতিশ্রুতি পেয়ে গেলাম।

শ্রীমন্তের সঙ্গে নিয়মিত ফোনালাপ শুরু হল। আসার দিন ঠিক হল জুলাইয়ের গোড়ায় ভরা শীতের মাঝে। প্রথম আলাপের আড়ষ্টতা ভেঙে শ্রীমন্তর সঙ্গে সম্পর্কটা ক্রমে অনেক সহজ হয়ে এলো। স্হির হল একটি সাহিত্য সন্ধ্যা জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে বাংলাদেশের প্রবাসী মানুষদের সঙ্গে যৌথভাবে। তবে আমি প্রথম থেকে একটা ব্যাপারে অনড় ছিলাম – ক্যানবেরা বাসের সময় উনি আমাদের বাড়িতেই আতিথ্য নেবেন।

সময়টা হঠাৎ কাছাকাছি এসে গেল। নোঙরামিও কিছুটা শুরু হল। কয়েকজন শ্রীমন্তর কাছে দরবার করল সুনীল কে তাঁদের বাড়িতে রাখার জন্য। বারকয়েক আমাকে শ্রীমন্তকে মনে করিয়ে দিতে হয়েছিল পিকনিকের দিনের সেই অনুচ্চারিত হলেও gentleman’s agreement-এর কথা। শেষে আমারই জয় হল। সাধারণত ঝগড়াঝাটি ঝামেলা এড়ানো মানুষ আমি – কিন্তু এই issue-তে কিছুটা street fighter-এর মত আচরণ ছিল আমার। এতদিন পরে সে কথা স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই ।

পৃথিবীর কোথাও-ই নিন্দুকের অভাব নেই। শুনলাম একজন বলে বেড়াচ্ছেন, ভাইসব গিন্নীদের সামলে রাখুন, গঙ্গোদা আসছেন। আর এক মহাত্মার ঘোষণা, বাংলার যুবসমাজের নপুংশকের দশা নাকি আংশিক ভাবে সুনীলের লেখার ফলস্বরূপ । মজার ব্যাপার হল, সুনীল আসার পর এই ভদ্রলোকেরই নির্লজ্জ চাটুকারিতা আমাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। যাইহোক, “কুছ তো লোগ কহেঙ্গে, লোগোকা কাম হায় কহনা” গানটি বেসুরো গলায় ভাঁজতে ভাঁজতে কাঙ্খিত দিনগুলির প্রস্তুতি নিয়ে চললাম।

(৭)

হেমন্তের পাতা ঝরা দিনগুলোর শেষে শীত এলো জুনের শুরুতে।

সেই সময়ে বেশ দায়িত্বপূর্ণ পদে সরকারী চাকরি করতাম। জুলাই মাসটা আবার বিশেষভাবে ব্যস্ত। বাড়ি ফিরতে প্রায়ই মাঝ রাত হয়েছে বিগত বছরগুলিতে। এসব আন্দাজ করে বহুদিন আগেই কর্মক্ষেত্রের অনিচ্ছুক প্রভুর কাছে ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে রেখেছিলাম। কাজও সহকারীদের যতদূর সম্ভব বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।

অবশেষে জুলাই-এর শুরুতে সেই দিনটি এলো। ক্যানবেরার পুরনো বাসিন্দা শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মশায়ের সঙ্গে সকাল সকাল সিডনির উদ্দেশে রওনা দিলাম। দুপুরের আগেই পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে – মানে শ্রীমন্তর বাড়িতে।

আবার দেখলাম সেই কিংবদন্তিসম মানুষটিকে দশ বছর বাদে। বেশ নিরাশ-ই হলাম দ্বিতীয় দর্শনে। এক দশকে চেহারার বেশ পরিবর্তন হয়েছে। প্রকৃতি celebrity দেরকেও ছাড় দেয় না। মধ্য পঞ্চাশের সুনীলের চেহারার সঙ্গে ছেষট্টি বছরের মানুষটির বিস্তর ফারাক।

আমার একই অনুভূতি হয়েছিল ৯২ সালে সিডনিতে এক সান্ধ্য আসরে আমার শৈশবের নায়ক সিনেমা তারকার মত সুদর্শন চুনী গোস্বামীর কিছুটা কালি মারা চেহারা দেখে।

স্বাতীদি নেমে আসার পরে শুরুর জড়তাটা যেন কোন অনুঘটকের ছোঁওয়ায় কেটে গেল। এমন একটা মানুষ যাঁর কিছুটা ছেলেমানুষি মেশানো আন্তরিক ব্যবহার পরিবেশকে মুহূর্তে পালটে দেয়।

তার দিন কয়েক আগেই সুনীলের আত্মজীবনী ‘অর্ধেক জীবন’ (দেশ পত্রিকাতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল) শেষ হয়েছে।

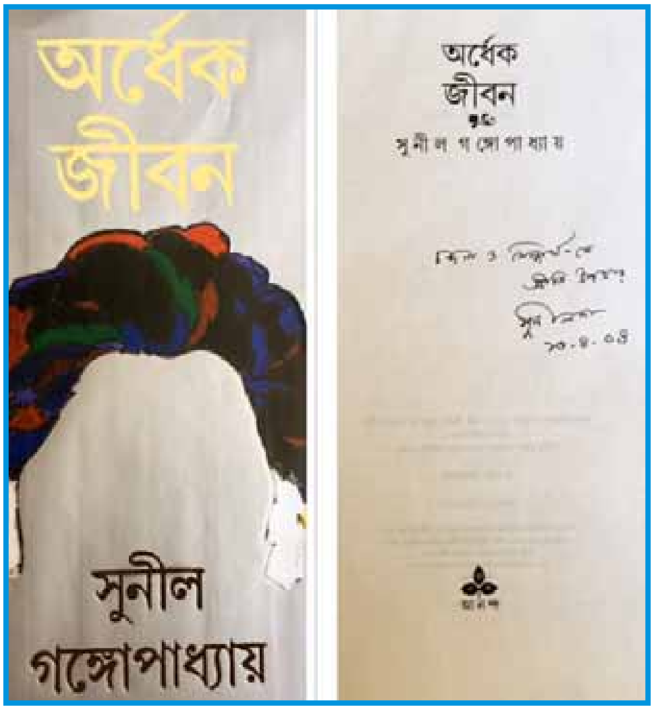

‘প্রশ্ন করলাম, অর্ধেক জীবনেই শেষ করলেন কেন, আরও অনেক কিছুই তো আমরা জানতে চাই। একটু ম্লান হেসে বললেন, এরপর বন্ধুবান্ধবের বিদায়ের পালা শুরু – আর লিখতে বাসনা হল না।’

সেদিনই শ্রীমন্তর রন্ধন পটিয়সী স্ত্রী গার্গীর (ডাকনাম মিষ্টি) সঙ্গে আলাপ হল। আতিথেয়তায় একশ তে একশ না দেওয়া কঠিন। বেশ কিছুদিন পরে সুনীল এক লেখায় গার্গীর এই বিশেষ গুণটির উল্লেখ করে জানিয়েছিলেন – “মেয়েটির ভাল নাম ভুলে গেছি, স্বভাবের সঙ্গে মিলিয়ে মিষ্টি নামটিই মনে আছে।”

(৮)

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর মাল পত্র গুছিয়ে ফেরার যাত্রা শুরু। দিনটা ছিল বুধবার।

আসার সময়ে শঙ্করদা গাড়ি চালিয়েছিলেন। ফেরার সময় আমার পালা। পাশে শঙ্করদা। পিছনে সুনীলদা-স্বাতীদি।

কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। নিজেকে চিমটি কাটতে ইচ্ছে হচ্ছিল ব্যাপারটা সত্যি কিনা পরখ করার জন্য। একটু প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে জানাই, খেলাধুলায় শূণ্য পারদর্শিতা সত্তেও, অবচেতনে বোধহয় আমার বাসনা ছিল খেলোয়ার হবার। আজও মাঝে মাঝেই স্বপ্ন দেখি মোহনবাগানের জার্সি গায়ে ফুটবল, বা ভারতের হয়ে ক্রিকেট খেলছি। স্বপ্নভঙ্গের পর নিজেকে বেশ অপদার্থ মনে হয়।

সিডনি শহর ছাড়িয়ে হাইওয়ে ধরলাম। গাড়ি ছুটছে ১১০ কিমি বেগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুনীলদার নাক ডাকার আওয়াজ পেলাম। স্বাতীদির অনুসন্ধিৎসু মনের নানা প্রশ্ন হয়ে চলেছে। কিছু উত্তর জানা, অনেকগুলিই অজানা। কফি খেতে থামলাম গোলবার্ন নামে ক্যানবেরা থেকে এক ঘন্টার দূরত্বের এক ছোট শহরে। নীচের ছবি দুটি সেখানেই তোলা। কাঁচা ঘুম ভেঙে ওঠার জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণে সুনীলদাকে খুব একটা উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল না সূর্যাস্তের আগেই বাড়ি পৌঁছলাম। সেজেগুজে চন্দনা অপেক্ষা করছিল। প্রথম অভ্যর্থনা মনে আছে “সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার বাড়িতে এলেন!”

বাচ্চাদুটো ঘুর ঘুর করছিল। ভাবছিল হয়তো বাবা মা এত গদ গদ কেন! স্বাতীদি ওদের দেখে উচ্ছসিত হয়ে বললেন “তোমাদের এত সুন্দর দুটো বাচ্চা আছে কেউ বলেনি তো!”

(চলবে)

সিদ্ধার্থ দে – আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতক। স্নাতোকত্তর পড়াশুনা আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যাম্পশায়ারে। ১৯৯০ সাল থেকে পাকাপাকি ভাবে অস্ট্রেলিয়াতে। দীর্ঘদিন ক্যানবেরা নিবাসী। ২০১৫-তে কর্মজীবন শেষ করে আপাতত সাহিত্য চর্চা, ভ্রমণ, টুকটাক লেখালেখি নিয়ে আছি। আর হ্যাঁ – ফেসবুকে, ওয়াটস্অ্যাপে ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়ানো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও জীবনের একটা বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে হালে। আমার মূলত ব্লগধর্মী কিছু লেখা desidd.wordpress.com সাইটটিতে সংকলিত করেছি।

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য

অচেনা ঢেউয়ের শব্দ

পর্ব ২

পতাকা তোলা আর আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের পর সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প গুজবে ব্যস্ত। বিষ্ণুপ্রিয়া বৌদি সকলের জন্য চা বানিয়ে নিয়ে এলেন। বোধিসত্ত্বের কাছে এসে বললেন কিছু হয়েছে ? অনেকক্ষণ ধরেই একটু আনমনা মনে হচ্ছে। শরীর ঠিক আছে তো ?

বোধিসত্ত্ব একটু আনমনেই উত্তর দিল, না কিছু না।

বিষ্ণুপ্রিয়া বৌদিরাও দুই মানুষে বাস করেন। স্বামী নারায়ণবাবু আজ সাত মাস প্যারালাইসিসে বিছানায়। এই বছরের জানুয়ারিতে হঠাৎ রাত্রিতে দরজায় ধাক্কা শুনে বেরিয়ে আসে বোধিসত্ত্ব। বিষ্ণুপ্রিয়া বৌদির আতঙ্কগ্রস্ত মুখটা এখনো মনে পড়ে। ওর ঠিক নিচের ফ্ল্যাটটাই ওনাদের। খুব তাড়াতাড়ি ও আর মাধববাবু হাসপাতালে নিয়ে গেলে সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেলেও বাঁ দিকটা অসাড় হয়ে যায়। ফিজিওথেরাপি চলছে। সারার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বিষ্ণুপ্রিয়া বৌদি দ্রুত সামলে নিয়েছেন। ওদের দুই মেয়ে। বিপদ আপদে সব সময় হাজির হয়। আজ যদিও কেউ নেই।

ছুটির দিন। একলা মানুষ বোধিসত্ত্ব। ঘরে ফিরে চিনি ছাড়া এক কাপ ব্ল্যাক কফি নিয়ে আসতে আসতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। ওদের সব কটা ব্লকই চার তলার। স্কাই রাইজ বলতে যা বোঝায় তা নয়। মোট আটখানা ব্লক। রামকৃষ্ণবাবু খুব মন দিয়ে সাজিয়েছেন এই আবাসনটি। বেশ খোলামেলা আর সবুজে ছাওয়া। তিনতলার বারান্দা থেকে বাইরেটা দেখতে বেশ মনোরম লাগে। এখনো ঘামে ভেজা পোশাক বদলায়নি ও। খুব বেশী না হলেও ধূমপানের অভ্যেসটা ছাড়তে পারে নি বোধিসত্ত্ব। আজ তো অফিসে যাবার তাড়াও নেই। চুপ করে দাঁড়িয়ে ও, আজ যেন মনটা পিছু হাঁটতে চাইছে।

বারান্দায় রাখা একটা অল্প হেলানো চেয়ার। হাতে কফির কাপ আর দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। আসতে আসতে কখন যেন কলেজ জীবনটা ভেসে আসছে জলছবির মতো।

মুর্শিদাবাদেই পড়াশোনা শেষ করে ও। কলেজে গিয়েই প্রথম কো-এডুকেশন। খেলাধুলোয় ওস্তাদ বোধিসত্ত্ব সকলের কাছে খুব অল্প দিনেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

কিন্ত কম কথার মানুষ নিজেকেই নিয়েই ব্যস্ত থাকত।

সেদিনটা সিনেমার পর্দার ছবির সাথে মিলিয়েই ছিলো, গরম ছোঁয়া প্রথম বর্ষা। কলেজ থেকে বেরিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়েছিল বোধিসত্ত্ব। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি ছুঁতে লাগলো ওর সারা শরীর। হাতে বই খাতা সেরকম কিছু ছিলো না। বৃষ্টির মধ্যেই পা বাড়ালো ও। খানিকটা হাঁটার পর হঠাৎ-ই দেখলো ওদেরই কলেজের মেয়েটিকে। পরম যত্নে ভিজিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। বৃষ্টির ধারা মেয়েটির কপাল গাল গলা ছুঁয়ে প্রবেশ করছে আরো গভীরে। আর প্রেমিকের স্পর্শে শিউরে ওঠার মতো মাঝে মাঝেই কেঁপে উঠছে সে। ওর পরনে ছিল পেঁচিয়ে ওঠা আকাশ নীল রঙের শাড়ী, বৃষ্টির জলে ভিজে সারা শরীরের ওঠানামার সাথে মিশে। আলগা সরে যাওয়ায় উন্মোচিত গভীর নাভিমূল তখন জলাধার। পা দুটো যেন পেরেক দিয়ে আটকে দিয়েছিল কেউ। ওর নাম যশোধারা, মুখার্জী পাড়ায় ঢুকে বাঁ দিকে এগোলে তিনটে বাড়ী পরে হলুদ রঙের একতলা বাড়ী, সামনে অনেকটা বাগান, ঘরে একটা বাঘের মত কুকুর আর সিংহের মতো বাবা আছে, উকিল। তবে মা মাটির মানুষ, ল্যাব এর পার্টনার সঞ্জয়ের দীর্ঘ আর নিখুঁত বর্ণণা, যেন কুরুক্ষেত্রর যুদ্ধের কথা শোনাচ্ছে ধৃতরাষ্ট্রকে। হতচকিত বোধিসত্ত্ব তাড়াতাড়ি এগোতে থাকলো, বোধ হয় একটু বেশীই তাড়াতাড়ি।

সাধারণত ভাজাভুজি বা বাইরের খাবার এড়িয়েই চলে বোধিসত্ত্ব। রান্নাটাও ছুটির দিনে নিজে হাতেই করে। আর অন্যান্য দিন সকালে ওটস বা কর্ণফ্লেক্স, দুপুরে অফিস ক্যান্টিনে টোস্ট আর বাইরে বেরিয়ে ফলের রস। যত রাতই হোক বাড়ী ফিরে হালকা হলেও ও রান্না করে, শুধু রুটিটা কেনা। ভাত সারা সপ্তাহে দু দিন। কর্পোরেটে হলেও মদ্যপান করে না ও। গিরিশ বাবু বলেন ওর নাকি বেঁচে থাকাই বৃথা। আজ সব কিছুরই ব্যতিক্রম। সুজাতা মাসিমা লুচি আর বেগুনভাজা নিয়ে হাজির। বললো ভাইঝি এসেছে, আজ ছুটির দিন, তুমি তো একলা মানুষ, দুটো খেয়ে নাও তো। না বলতে পারলনা ও।

গিরিশবাবু আর রামকৃষ্ণবাবু একসাথে বাজার করতে বেরোলো। রুক্মিনী গলা চড়িয়ে বললো, বাজার এলে রান্না হবে, এটা যেন মাথায় থাকে। গিরিশবাবু তখন গুন গুন করছেন কোনো গানের কলি। শব্দগুলো কানে ঢুকলো কি না বোঝা গেল না। তবে যাকে শোনানোর জন্য বলা সেই রামকৃষ্ণবাবু শুনলেন।

আশুতোষবাবু আজ পড়ানো থেকে ছুটি পেয়েছেন। আবাসনের ভিতরের ফুলের বাগানের তদারকি করছেন। যদিও মালী আছে। মহাবীর বাবু একটা ব্যাগ নিয়ে কোথাও বেরোচ্ছিলেন। আশুতোষবাবুর সাথে একটু কথা হলো। তারপর হাত নেড়ে বিদায়। বোঝা গেল দেশে চললেন উনি। দেখা যাক এবার পরিবার নিয়ে আসেন কি না। শুধু মাধববাবুকেই দেখা গেলো না। বহুদিন পর তেতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কারুর তৈরী লুচি আর বেগুনভাজা সহযোগে জলযোগ সারতে সারতে এত কিছু দেখলো বোধিসত্ত্ব। বেলা বাড়ছে, এবার স্নানে যেতে হবে। পোষাক ছেড়ে স্নানে যাবার আগে হঠাৎই আয়নার দিকে চোখ পড়ল বোধিসত্ত্বর। নির্মেদ, দীর্ঘদেহী, বুকের লোমে ইদানিং একটু সাদার ছোঁয়া, নিজেই আনমনে হেসে ফেললো।

স্নান সেরে বেরিয়ে বোধিসত্ত্ব টি শার্ট আর জিন্স টা চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আবাসনের উত্তর দিকটা দিয়ে মাধববাবুকে চোখে পড়লো হাতা গোটানো পাঞ্জাবী আর জিন্স, চোখে সানগ্লাস। হনহন করে আসছেন কোথাও থেকে। একটু অবাকই হলো ও, এতদিনে একবারও সানগ্লাস পরতে দেখেনি মাধববাবুকে। হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে একটু যেন চমকে গেলেন। একটু হেসে এগিয়ে গেলেন। দূরে তাকিয়ে বোধিসত্ত্ব দেখলো সুজাতা মাসিমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাদেরই দেখছে। বাজার থেকে নিজের মত অল্প চিকেন কিনে ফিরে এলো বোধিসত্ত্ব। একটা ছুটির দিন, একটু যেন আলসেমি ভর করেছে ওকে। ফেরার সময় দেখলো রামকৃষ্ণবাবু মন্দির পরিষ্কারে হাত লাগিয়েছেন। বরাবরই এই কাজটা ওনার। বিষ্ণুপ্রিয়া বৌদিও আছেন সাথে। ওনার স্বামী কে নিয়েই টুকটাক কথা হচ্ছে। শুনতে পেল আজ ফিজিওথেরাপি নেই। মন্দিরের কাজ সেরে নারায়ণবাবুকে স্নান করানো, খাওয়ানো। আশুতোষ বাবুকে আর বাগানে দেখা গেলো না। আকাশটাও মেঘলা হচ্ছে।

তাড়াতাড়িই ভাত আর চিকেন বানানো হয়ে গেছিল। সকালে স্নান সারলেও আর একবার যাওয়া দরকার। দ্বিতীয়বার স্নান সেরে খেতে বসতে বসতে একটা বাজলো। আবাসনের বহু ঘরেই এখনো রান্না হয় নি। আকাশটা বেশ কালো হয়ে উঠছে। আবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো বোধিসত্ত্ব। আজ ও দাড়ি কাটেনি। একটা মাটির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বাইরেটা এই বারবেলাতেই বিকেল। বেশ জোরে হাওয়া বইছে। আমাদের জাতীয় পতাকাও তাল মিলিয়ে পত পত করে উড়ে জানান দিচ্ছে স্বাধীনতার অস্তিত্ব। গন্ধটা বাড়ছিল। শুরু হলো বৃষ্টি। সাথে এলোমেলো হওয়া। বৃষ্টির ছাট উড়ে এসে ভিজিয়ে

দিচ্ছিল বোধিসত্ত্বকে। ঘরে ঢুকে বারান্দার দিকের জানলাটার কাঁচ সরিয়ে দিলো ও। সব গুলোই স্লাইডিং। প্রতি ঘরেই এসি আছে। বাইরে ঝড়ের তালে মাথা দোলাচ্ছে গাছগুলো। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো এঁকে বেঁকে সৃষ্টি করে চলেছে নানা আল্পনার। প্রকৃতির এই ভেজা ভাব, সবুজের হেসে ওঠা, কতদিন এই ভাবে বৃষ্টি দেখেনি ও।

সেদিন কলেজ থেকে বাকি পথটা সঞ্জয় সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল। গুরু একটু যেন হৃদয়ে টোকা লেগেছে মনে হচ্ছে। বোধিসত্ত্ব কোনো উত্তর দেয় নি। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হাঁটা লাগিয়েছিল। গুরু তুমি তো ভীষ্ম, তুমিও আটকে গেলে তো। যেতেই হবে। এত রূপ নয় যেন আগুন। আরে সকাল বিকেল চক্কর চলে জানো, ভোর পাঁচটায় জগিং, সাথে ওই কুকুরটা, কি যেন নাম কি রট হুইলার না কি যেন, সে নাকি শুধু ওই দামিনীর কথাই শোনে। কেমন নামটা দিয়েছি বলো। বাংলা অনার্স। হাত দিলেই পুড়ে একদম ছাই। সপ্তাহে তিনদিন পড়তে যায় ইংলিশ, গাড়িতে, কালো কাঁচ, দেখা যায় না। সোম, বৃহস্পতি আর রবি। কলেজে কিন্ত রোজ আসে। তোমার গুরু সাইন্স তাই খেয়াল করোনি। কিন্ত পুরো কলা বিভাগকে কলা দেখিয়ে আমাদের রাতের ঘুম শেষ করে দিয়েছে। হেসে ফেলল বোধিসত্ত্ব। বললো বাড়ী গিয়ে স্নান সার। ভোর বেলা দৌড়াদৌড়ি ওর ছোটবেলার অভ্যাস। কোনো এক অজানা কারণে ও দিকভ্রষ্ট হলো। দৌড়তে দৌড়তে অন্য পথ মাড়িয়ে যখন ফিরছিল তখন হঠাৎ সঞ্জয়, গুরু তুমিও!! অপ্রস্তুত বোধিসত্ত্ব কিছু বলতে যাবার আগেই সঞ্জয় ইশারা করলো। কালো টি শার্ট আর কালো ট্র্যাক প্যান্ট, সঞ্জয়ের কথাকে সত্যি প্রমাণ করেই বিদ্যুৎ ঝলকের মত যশোধারার প্রস্থান।

ওই পাড়ার যে কটি বর্ধিষ্ণু বাড়ী আছে যশোধারারা তাদের মধ্যেই পরে। বাবা সত্যপ্রিয় মুখার্জী, পেশায় উকিল। লোকে আড়ালে তাঁর নাম নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে থাকে। মা লোপাদেবী, গৃহবধূ। মাটির মানুষ। সকলের সাথে সদ্ভাব রাখেন। অপরূপ সুন্দরী মায়ের এক মেয়ে, মায়ের রূপ-ই পেয়েছে। পড়াশোনাতেও বেশ ভালো বলেই খ্যাতি আছে। পাড়াতেও লোকে গণ্যমান্য করে। যশোধারাও নিজেকে নিয়েই থাকে।

সেদিন কলেজ থেকে একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়েছিল বোধিসত্ত্ব। ফেরার সময় মন্টুদার দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছিল ও। উল্টোদিকে তাকাতেই – এবার আর বোধিসত্ত্ব দাঁড়ালো না। ও জানে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের প্রেমে পড়া নিষেধ। আর যার আবার বাবা মা কেউ নেই। সিগারেট ধরিয়ে হাঁটা লাগালো যশোধরার সামনে দিয়েই। এই প্রথম কেউ বিদ্যুতের ঝলকানিতে চোখ বুজল না। দুধ সাদা এমবাসডারটা যখন পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বোধিসত্ত্বর মনে হলো কাঁচটা নামানো।

(চলবে)

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য – কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য সম্প্রচার দপ্তরের কর্মী। বর্তমানে কলকাতা দূরদর্শন ভবনে কর্মরত। বহুদিন থেকেই চলে আসছে সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠ এবং নিভৃত চর্চা। পেশাগত ও পারিবারিক ব্যস্ততায় যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল তাঁর এই সৃষ্টিশীলতার ধারা, সে সময় এক বুধ সকালে আকাশবাণী মৈত্রীতে তাঁর নিজের লেখা পড়তে শোনা (এবং তারপর থেকে প্রায় নিয়মিত সেরার বাছাই এর তালিকায়), তাঁর সাহিত্যচর্চায় নতুন উৎসাহের সঞ্চার করে। সেই থেকেই চলে আসছে জীবনের জলরঙে স্বপ্ন বোনার কাজ, কখনো ছন্দে, কখনো বা গদ্যে . . .

দেবীপ্রিয়া রায়

একদিন যারা

পর্ব ২

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি

পূজার্থীদের ভিড়ের মধ্যে মন্দির প্রাঙ্গনে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি লোক-বয়েস তিরিশ কি বত্রিশ হবে তার। ধূসর মোটা আলখাল্লা তার পরনে, ধূলিধুসরিত পা, মুখে পাতলা পাতলা দাড়িগোঁফ। লোকটির চোখমুখ দৃঢ়তাব্যঞ্জক, শান্ত কোমলতায় ভরা। কিন্তু এই মুহূর্তে তার চোখদুটিতে ক্রুদ্ধ ভাব, ঘন কালো ভুরু দুটি বিরক্তিতে কোঁচকানো। ঘুরতে ঘুরতে মাঝে মাঝে সে দাঁড়িয়ে পড়ে চলমান ব্যস্ত জনতার কথাবার্তা কান পেতে শুনছে আর তার মুখে একটা সংকল্পের রেখা দেখা দিচ্ছে। যখন সে প্রাঙ্গনে পা রেখেছিল, তার সাথে গোটা বারো সাঙ্গোপাঙ্গ দেখা গিয়েছিল-বয়সে তারা লোকটির থেকে বড়ই হবে, কিন্তু তারা সবাই তাকে রীতিমত সম্ভ্রমের সাথে সম্বোধন করছিল বলেই মনে হচ্ছিল। এখন অবশ্য সে একা – তার সাথীরা কুণ্ডে নাইতে গেছে, কেউ কেউ বলির পশু দাম করছে। ঘুরতে ঘুরতে লোকটি থমকে দাঁড়ালো। ভাঙতি পয়সার সওদা করনেওয়ালাদের দিকে একটা শোরগোল, হাতাহাতি লেগেছে, কে যেন পুরো হিসেবমত ভাঙতি ফেরৎ পায়নি। এখানে এমন ঘটেই থাকে, কেউ সেদিকে বিশেষ মন দিল না। কিন্তু সেই যুবা লোকটি হঠাৎ সেই বিবদমান প্রতিপক্ষদের মাঝে ঢুকে পড়ল, আর তারপর তার উঁচু গলার ধমক শোনা গেল, 'কি করছো তোমরা? এ যে পিতার মন্দির, তিনি বলে দিয়েছেন যে এ কেবল প্রার্থনার স্থান – এই পবিত্র প্রাঙ্গনকে তোমরা চুরি চামারি, অর্থলোভে অশুচি করে তুলেছো! এ মন্দিরে পিতা বাস করবেন কি করে-এই পাথরের স্তূপ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে যাবে, একটিও থাকবে না!' উদগ্র ক্রোধে সে পয়সা সাজান দোকান গুলি ভেঙে ফেলতে লাগল, উল্টে দিল তাদের পসরা-ঝন্ঝন্ করে পয়সা ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। মূহুর্তে স্তব্ধ হয়ে এল মন্দির প্রাঙ্গন-কেবল পশু পক্ষীর চিৎকার ছাড়া সেখানে আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। যুবকটি হাঁপাচ্ছিল, এমন সময়ে ছুটে এল তার সঙ্গীরা – 'শান্ত হন্, শান্ত হন্। কি করছেন আপনি? বিপদে পড়বেন যে!' বোঝাই যাচ্ছিল যে তারা পুরো ঘটনাটায় বেশ বিব্রত। 'বিপদ? বিপদের ভয়ে কি সত্য বলবো না? শোনো তোমরা – এই বাহ্য শুচি আর অশুচির কোন মূল্য নেই পিতার কাছে। অর্থের মূল্যে কি শুচিতা কেনা যায়? আচার অনুষ্ঠান তোমার অশুচি অন্তরকে শুচি করে তুলতে পারে না। তোমার পিতার আসন পাতা তোমার অন্তরে। সেই আসনটিকে ধুয়ে মুছে স্বচ্ছ করো, তবেই তিনি প্রীত হবেন।' খানিক আগের নৈঃশব্দ্য কেটে গিয়ে যুবাটিকে ঘিরে জনতার গুঞ্জরন শুরু হল। অনেকেই একসাথে তার সাথে কথা বলতে চায় – কেউ তাকে প্রশ্ন করতে চায়, কেউ বা প্রতিবাদ, আবার অনেকে একেবারে হতভম্ব হয়ে চেয়ে রয়েছে, এমনও দেখা গেল। দুয়েকজন মাথা দুলিয়ে সমর্থন করছে বলেও মনে হল।

তাদের মধ্যে একজন ফিসফিস করে বলল, 'আগেকার দিনে আইসাইয়াহ, জেরেমাইয়াহ – এইসব ঈশ্বরপ্রেরিত লোকেরাও অনেকটা এই ধরণের কথা বলতেন।' 'মোটেই না-' আরেকজন আপত্তি জানাল। 'এ লোকটা যা বলছে, এ তো প্রায় রাজদ্রোহের সামিল। মুদ্রা, টাকা এসব তো রাজার ভাণ্ডার থেকে আসে। তাকে অবহেলা করা মানে তো যথেচ্ছাচারিতা। তোরা কি বলিস্ যে ঈশ্বর আমাদের যথেচ্ছাচারে খুশি হবেন? যত্তোসব!'

কথাটা যুবকটির কানে গেল; শান্ত সুরে সে বলল, 'স্বর্ণমুদ্রার গায়ে রাজার মুখের ছাপ মারা থাকে, সে তো রাজারই প্রাপ্য। ঈশ্বর তো রাজস্ব চান্ না। তিনি চান তোমার ভালবাসা। তোমার হৃদয়, তোমার শক্তি, তোমার বুদ্ধি, তোমার আত্মা, সবটুকু দিয়ে শুধু তাঁকে আঁকড়ে ধর। এই বিশ্বে তোমার সকল প্রতিবেশীর মাঝে তিনি ছড়িয়ে আছেন – তুমি এদের সকলকে ভালবাসা দাও। ক্ষুদ্র লোভ আর স্বার্থপরতা তোমার পথ আগলাবে। চেষ্টা কর যাতে তাদের উর্ধে উঠতে পারো, না পারলে পিতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তাঁকেই পথ দেখাতে বল। আমি বলছি, তিনি তোমায় কোলে তুলে নেবেন। কিন্তু

এই হাটের বিকিকিনি আর গোলযোগের মাঝে তাঁর নাম নিয়ে তাকে কলুষিত করো না।' সে বলে যেতে লাগল আর তাকে ঘিরে উৎসুক মুখের জটলা বাড়তে লাগল। কথাগুলি অনেকের মনেই ধরছে বলে মনে হল। কুন্ডে নাইবার লোকের সারি ক্ষীণ হয়ে এল, বলির পশুপাখি কেনার তাড়াহুড়োটাও ঝিমিয়ে পড়ল।

<u>খাইয়াপাসের দুশ্চিন্তা</u>

মন্দির প্রাকারের ওপর একটি বাড়ীর বিশাল বারান্দার খানিক অংশ দেখা যায়। সেই বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে একজন এতক্ষণ সমস্ত ঘটনাটা মন দিয়ে দেখছিল। লোকটির নাম খাইয়াপাস – সে এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। বা পান্ডা। বিগত পনের বছর ধরে সে এই পদে কাজ করছে। এতদিন এই পদে টিঁকে থাকাটা সহজ নয়, কিন্তু খাইয়াপাস লোকটি যেমনি ধূর্ত, তেমনি সুযোগ সন্ধানী। তার আসনের ধারেকাছে কোনো প্রতিযোগীকে সে আসতে দেয়নি। এতদিন এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত থেকে সে এখন কেনানের সর্ব্বাপেক্ষা ধনীদের মধ্যে অন্যতম। রোমান রাজ্যশাসকরা অবশ্য তাকে বিশেষ পাত্তা দেয় না, তবু সে তাদের সাথে সদ্‌ভাব রেখে চলে; ফলে ইহুদী সমাজে তার প্রতিপত্তি অসীম।

এদিকটায় সহসা কারু চোখ পড়ে না। পাঁচিলের এইদিকে পুরোহিতদের বাড়ি আর তার মধ্যে সবচেয়ে বিলাসবহুল বাড়িটিই খাইয়াপাসের। তার এই এত ধন সম্পদ আর বৈভবের মূলে রয়েছে ঐ মন্দিরটির ভক্তস্রোত আর আচার অনুষ্ঠান। আজকে এই ভুইফোঁড় যুবকটি মনে হচ্ছে তার রোজগারের মূলে কুঠারাঘাত করতে হাজির হয়েছে। খাইয়াপাসের ভুরু কুঁচকে উঠল। দুইদিন বাদে পেসাখের উৎসব, মন্দিরে ভক্তের ঢল নেমেছে তার এখন দম ফেলবার ফুরসুৎ নেই, তাছাড়া এই লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে কোন রকম বেফাঁস কিছু করে বসা ঠিকও হবে না। তা বলে ব্যপারটা বাড়তে দেওয়াটাও বুদ্ধির কাজ নয়। কিছু একটা বিহিত করতে হবে – তবে কিছু করার আগে এই ছোকরার সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। কথাবার্তা বেশ ভাল বলতে পারে দেখাই যাচ্ছে, লোকজন বেশ হাত করতে পারে। সঙ্গে গুটিকতক ষণ্ডাগুন্ডা চ্যালচামুণ্ডাও রয়েছে। দেখেই বোঝা যায় যে তারা চাষাভূষো মানুষ – এদের ক্ষেপালে পরে ঝামেলা হতে পারে। খাইয়াপাস চিন্তিত ভাবে নিজের চরদের ডেকে পাঠাল।

<u>আমায় যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি</u>

যে যুবকটিকে নিয়ে খাইয়াপাস এত চিন্তিত, সে এতক্ষণে নিজের সঙ্গীসাথীদের নিয়ে নগর সীমার বাইরে গিয়ে পড়েছে। অলিভ পাহাড়ের এদিকটা নির্জন, তাদের ছোট দলটি আপাততঃ এইখানেই বিশ্রাম নিচ্ছে। তার সঙ্গীরা উত্তেজিত ভাবে আজকের কথা নিয়ে আলোচনা করছিল, কিন্তু তার মুখে কোন কথা শোনা যাচ্ছেনা। এতখানি পথ সে চুপচাপ নিজের মনে হেঁটে এসেছে। একজন বলল, 'কর্তা, তাহলে মনে হয় আপনার কথাগুলি আজকে সকলেরই ভালো লেগেছে।' অন্যজন মাথা নেড়ে বলল যে , 'আমি তো পেথ্থমে ঘাবড়ে গিছিলুম, যে ভাবে তেড়েফুঁড়ে উঠেছিল সকলে। তারপর আপনি মুখের মত জবাবটা দেওয়াতে কেমন মন দিয়ে শুনলো আপনার কথাগুলো।'

'বুঝলে না, এইবারে এইসব বুজরুকি কিছু কমবে। পুরুৎগুলো যে হারে টাকা টানছিল-বাবাঃ।' এ কথাটা বলল তৃতীয়জন। সবাই উৎসাহে টগবগ করছে, কেবল একজন ছাড়া। জুডাস ইস্ক্যারিয়ট কোণের দিকে একা বসেছিল, মুখে তার কেমন একটা বিদ্রুপের হাসি।

যুবকটি – যীশু তার নাম, একবার জুডাসের দিকে তাকিয়ে দেখলো, তাকালো তার অন্যান্য সাথীদেরও দিকে – করুণায় মনটা ভরে উঠল তার। সহজ সরল মানুষ এরা – কত সরল বিশ্বাসে তাকে অনুসরণ করে নিজেদের ঘর পরিবার সব ছেড়ে তার সাথে সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে আজ দুই বছর। কেবল জুডাসের বিশ্বাসে যে চিড় ধরেছে, তা যীশু অনুভব করতে পারছে।

তার অন্য সঙ্গীরা ভাবে সে ঈশ্বরের অবতার, জুডাস তা মেনে নিতে পারছে না।

সত্যিই কি সে অবতার ? সে নিজেও ঠিক বুঝতে পারেনা সে কি ! তবে এটুকু সে জানে যে জীবনে চলার জন্য যেটি ঠিক পথ, সেটি তার অন্তরের মধ্যে সে আলোর মত স্বচ্ছ দেখতে পায় । একেই কি ঈশ্বরের ইচ্ছা বলা হয়, বলা হয় তাঁর দেখিয়ে দেওয়া পথ ? কি জানি !

এই যে খাওয়া দাওয়া পোশাক পরা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুচি, অশুচির বাধা, নিয়ম নিষেধের নিগড়, এই যে পশুবলির উন্মত্ততা — এসব কেন, তা যীশু বোঝেনা । ইহুদীদের কাছে ঈশ্বরের কোনো নাম নেই, নেই তাঁর কোন রূপ — শুধু তাঁর বলে দেওয়া মানবতার নিয়মটুকু মেনে চলাটাই তাঁকে পূজার একমাত্র পথ । তাহলে তো ঐসব আচার অনুষ্ঠানগুলি ক্ষমতালোভীর ক্ষুদ্র লোভ আর স্বার্থপরতার প্রকাশ, এর মধ্যে পূজার ভাব কই ?

আজ প্রথম এই কথা সে ভাবছে না । যখন বছর বারো বয়েসে বাবা, মায়ের হাত ধরে সে এই মন্দিরে প্রথমবার এসেছিল, তখনই এই সত্যিটা তার চোখে ধরা পড়েছিল । সেবার সে এই নিয়ে পুরোহিতদের সাথে তর্ক করতেও চেষ্টা করেছিল । বালক হলেও তার যুক্তির অভাব ঘটেনি, প্রায় তিনদিন ধরে সে তর্কযুদ্ধ চলেছিল । সে যে মন্দিরেই বসে আছে, ভিড়ের মধ্যে বিপর্যস্ত তার বাবা, মা সেদিন তা দেখতে পান্‌নি । তাঁরা তার বাকি ভাইবোনদের নিয়ে তাকে খুঁজতে খুঁজতে প্রায় তাদের বাড়ি ন্যাজারেথ ফিরে চলে গিয়েছিলেন । সেখানেও তাকে দেখতে না পেয়ে ভয়ে উদ্বেগে পাগলের মতো আবার জেরুসালেমে ফিরে এসে তাকে নিয়ে তবে বাড়ী ফেরেন ।

মিছামিছি তাঁদের বিব্রত করেছিল সে সেদিন । পুরোহিতরা যে তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কথা মেনে নেবে না, এটা সে এখন বোঝে । তাই তারপর হতে সে আর তর্কের পথে যায় না, বরং নিজের কথা সহজ গল্প আর উদাহরণ দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে । তারাও তার কথা পুরোপুরি মেনে নিতে পারত কিনা, কে জানে ? কিন্তু আজকাল তার দৈবী ক্ষমতা সম্বন্ধে একটা রটনা এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে । অত্যন্ত আশ্চর্য ভাবেই তার হাত দিয়ে মাঝেমাঝে কিছু কিছু অলৌকিক ব্যাপার ঘটে যায় । খুব অন্তর দিয়ে যখন সে কিছু চায়, এবং সে চাওয়াটা সাধারণতঃ তার মা মেরীর অনুরোধ রাখতে গিয়েই তীব্র ভাবে জেগে ওঠে, ব্যাপারটা তখন আপনাআপনি ঘটে যায় । কেন এমন হয়, কে জানে ! হয়তো ভালবাসাই এর কারণ ! মা'কে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, যদিও মা'র কাছে থাকা তার সবসময় ঘটে ওঠেনা ।

যীশু শুনেছে তার মা নাকি তাকে কুমারী অবস্থায় ঈশ্বরের আদেশে বিনা প্রতিবাদে নির্দ্বিধায় গর্ভে ধরেছিলেন । তখনও তিনি অনাঘ্রাতা কুমারী মাত্র, উপরন্তু তিনি ছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ স্বামী জোসেফের বাগদত্তা । কতখানি বিশ্বাসের জোর থাকলে একটি কুমারী ঈশ্বরের এই আশ্চর্য আদেশ মেনে নিতে পারে, ভেবে যীশুর অবাক লাগে, আরো অবাক লাগে জোসেফের ভালবাসবার ক্ষমতা দেখে, যিনি তাঁর কুমারী বধূর মাতৃত্বকে মেনে নিয়েছিলেন । তার জন্মের আগের এই ঘটনা অলৌকিক বৈ কি ! কিন্তু জন্মের পর যীশুর বাবা মা তাকে আর পাঁচটা সাধারণ শিশুর মতই মানুষ করেছেন । পিতা জোসেফ তাকে নিজের পেশা ছুতোরের কাজ শিখিয়েছেন যত্ন করে । ত্রিশ বছর পর্যন্ত যীশু সে কাজেই সময় কাটিয়েছে । যদিও চারিধারের বিশৃঙ্খলা, অশিক্ষা, কুসংস্কার তাকে অস্থির করে তুলছিল, তবু সে অন্যদের শিক্ষা দেওয়ার বা ধর্মযাজনার ইচ্ছা অনুভব করে নি । অথচ আজ সেই কিনা ধর্মযাজক !

(চলবে)

দেবীপ্রিয়া রায় — লিখছেন স্কুল ও কলেজের দিন থেকে । পেশায় দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপিকা ও গৃহিণী । কাশীর প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে দেবীপ্রিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে ডক্টরেট করে বিবাহসূত্রে সেই বছরেই আমেরিকা এসে শিকাগো শহরে বাসা বাঁধেন । গত ৪০ বছর শিকাগোর বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের সাথে নানা ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন । সাহিত্য চর্চা দেবীপ্রিয়ার নেশা । শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম সদস্য ।

রম্যরচনা

স্বর্ভানু সান্যাল

পর্ব ২

শব্দের জন্মকথা

আজকে আপনাদের কিছু শব্দের জন্মকথা নিয়ে গল্প বলব। আমি, আপনি আমরা সকলেই তো এক একটা সতন্ত্র সত্ত্বা – সকলেরই একটা গল্প আছে। তেমন শব্দদেরও আছে এক একটা নিজস্ব শরীর, মন আর ইতিবৃত্ত। কিছু কিছু শব্দের জন্মকথা ভীষণ হৃদয়গ্রাহী বা ইন্টারেস্টিং। মানুষ যখন থেকে নিজের হাত পা আর মুখের বিভিন্ন পেশীর ওপর সম্পুর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে তখন থেকেই তার অন্যদের সাথে যোগাযোগের শুরু। হাসি, কান্না, কোঁচকানো ভুরু, অঙ্গুলিনির্দেশ এ সবই শব্দ বা ওয়ার্ডের সাহায্য ছাড়াই যোগাযোগ সাধনে সমর্থ। মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ কি না বলা, হাত তুলে অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা, হাততালি দিয়ে সমর্থন বা উৎসাহ প্রদান, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বা বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে কাউকে কাঁচকলা দেখানো এ সবের মাধ্যমে আমরা নিয়মিত শব্দ ছাড়াই ভাব প্রকাশ করে থাকি। তার ওপর ধরুন ক্রিকেটের মাঠে আম্পায়ার বা ফুটবল মাঠের রেফারি পুরো ম্যাচ জুড়েই কোন কথা না বলেই সাঙ্কেতিক ভাষায় নিজের সিদ্ধান্ত জানাতে থাকে। কোন বিস্মৃত অতীতে এই সাঙ্কেতিক ভাষা থেকে মানুষ লিখিত বা কথ্য ভাষায় উত্তীর্ন হয়েছিল ইতিহাস তার উত্তর দিতে অসমর্থ। কিন্তু তাও কিছু কিছু শব্দের জন্ম বৃত্তান্ত সন্দেহাতীত ভাবে জানা যায়। যেমন ধরুন ইংরেজি শব্দ write এসেছে writan থেকে যার আদতে মানে হল আঁচড় কাটা। গাছের বাকলে বা পাথরে কোন ছুঁচোল জিনিস দিয়ে আঁচড় কেটেই প্রাগৈতিহাসিক মানুষেরা প্রথম লিখিত ভাবে নিজের ভাব প্রকাশের চেষ্টা করেছিল। আর প্যাপিরাস গাছের ছাল শুকিয়ে যে প্রথম পেপার তৈরী হয়েছিল এ তথ্য আপনাদের সকলেরই জানা। ল্যাটিন শব্দ penna যার আসল মানে হল পালক তার থেকেই pen শব্দটির উৎপত্তি সেটাও বোধ হয় আপনাদের অজানা নয়। শুকোনো পাখির পালকের ডগা দিয়েই মানুষের প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি। কিন্তু আজ আমি কিছু অন্য ইংরেজি শব্দের গল্প বলব।

কিন্তু তার আগে ইংরেজি শব্দের প্রথম দুই আদ্যক্ষরের জন্মকথা একটু সেরে নিই। লেবানন, সিরিয়া, গাজা, ইজরায়েলের উর্বর অববাহিকা অঞ্চলে আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল সেমিটিক সভ্যতা। ভারতবর্ষে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে ওঠার কিছু পরে পরেই এই সভ্যতার পত্তন। সেই প্রাচীন ফোনেশিয়ান সভ্যতায় জাগতিক উন্নতি বা মেটিরিয়াল প্রস্পারিটির সর্বপ্রধান সূচক ছিল Ox বা ষাঁড় যার তৎকালীন প্রতিশব্দ ছিল Aleph. এই Aleph থেকেই A শব্দের উৎপত্তি। যেহেতু কৃষিপ্রধান সভ্যতায় ষাঁড়ের ব্যবহারিক মূল্য ছিল অসীম, সুতরাং ইংরেজি বর্ণমালায় এটি যে আদ্যক্ষর হিসেবে স্থান পেয়েছে সেটি কিছু আশ্চর্য নয়। এমনকি শুরুর দিকে এটি লেখা হত V এর আদলে যেটা কিনা ছিল ষাঁড়ের শিং এর প্রতিরূপ। পরে গ্রীক সভ্যতায় অক্ষরটিকে উল্টে নেওয়া হয়। খাদ্য উৎপাদনের পরে মানুষের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আশ্রয়। ফোনেশিয়ান ভাষায় Beth মানে তাঁবু বা বাড়ি। তাই থেকেই আমাদের আজকের B এর জন্ম। B তে যে দুটো অর্ধবৃত্ত বা চেম্বার আছে সেটা আদতে একটি ছেলেদের ঘর আর একটি মেয়েদের ঘর – মানে আজকের দিনে আমাদের টু বেডরুম ফ্ল্যাট আর কি ! অক্ষর সম্বন্ধে আরও বেশি কিছু বললে বোর হয়ে যাবেন, তাই এবার একটু শব্দে যাওয়া যাক।

প্রথমেই একটা clue দিই থুড়ি মানে clue শব্দ সম্বন্ধে বলি। একটি গ্রীক পৌরাণিক গল্প থেকে এর উৎপত্তি। ক্রীট দ্বীপে মিনোটার নামে একটা আধা-ষাঁড়-আধা-মানুষ দৈত্য একটা ভুলভুলাইয়ার মধ্যে লুকিয়ে ছিল। গল্পের নায়ক থিসিয়াস তাকে মারবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তার প্রেমিকা, রাজকন্যে অ্যারিয়াডনে তাকে একটা সুতো দিয়েছিল যেটার একটা প্রান্ত সে ধরে থাকবে আর সুতো ছাড়তে ছাড়তে থিসিয়াস সেই ভীষণাকার দৈত্যকে মারতে এগিয়ে যাবে যাতে দৈত্য হননের পর সে ঠিক মত বেরিয়ে আসতে পারে সেই maze বা ভুলভুলাইয়া থেকে। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন তখন থেকেই মেয়েরা তার হবু বরের সুতোটি ধরে রেখেছে। সে যাই হোক, তখনকার ভাষায় সুতোকে clewe বলা হত। তাই থেকেই clue শব্দটি এসেছে যার মানে হল যা আমাদের কোন puzzle সমাধানে সাহায্য করে।

এবারে আপনাদের বলি নিকোলাসের গল্প। নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীতে Nicholas Chauvin বলে এক সৈন্য ছিল তার প্রভুভক্তি এতই প্রবল ছিল যে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ন বাজে ভাবে হেরে যাওয়ার পরও এই প্রচণ্ড ভাবে আহত মানুষটি সর্বত্র নেপোলিয়নের গুণগান করে ফিরত। শেষমেশ তার প্রভুভক্তি হাসির বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং নাট্যকার স্ক্রাইব তাকে নিয়ে ক্যারিকেচার করে একটি নাটক লেখেন। সেই থেকেই এসেছে শব্দ Chauvinism যার মানে হল কোন এক আইডিওলজি বা আদর্শর প্রতি অযৌক্তিক ও তীব্র আকর্ষণ।

এবার হোক জিন নিকোটের গল্প। ভাষাতত্ত্ববিদ এই ফরাসী মানুষটি যখন লিসবনে ফ্রান্সের অ্যাম্বাসাডার হিসেবে কাজ করতেন, তখন একটা অদ্ভুত গাছের বীজ নিয়ে এসেছিলেন যেটা কিনা একটা অতি আশ্চর্য জায়গা আমেরিকা থেকে লিসবনে এসেছে। সেই আশ্চর্য গাছের পাতার ব্যবহার বন্ধ করতেই আজকের স্বাস্থ্যকর্মীদের যাকে বলে একেবারে নাভিশ্বাস। হ্যাঁ ওনার নামেই এই গাছের নাম দেওয়া হয় নিকোটিন। তারপর ধরুন Assassin. আজ থেকে প্রায় আটশ বছর আগে আরবের পাহাড়ি মরুভূমিতে এক শেখ ছিল যার পোষা দুর্বৃত্তরা ওই পথ দিয়ে যাওয়া যেকোনো মানুষকে নির্দয় ভাবে হত্যা করত। আর সেই কাজের মানসিক প্রস্তুতি নিতে হ্যাসিস নামক এক ধরণের ড্রাগ নিত। এই খুনে ডাকাতদের বলা হত hassassin যার থেকে এসেছে শব্দ assassin যারা মানুষ মারার কাজ করে।

কমরেড শব্দ শুনলেই যদি আপনার কাস্তে-হাতুড়ি-তারা মনে পড়ে যায় কিম্বা মধ্যপ্রদেশের রেড করিডোর তাহলে জেনে রাখুন কমরেড শব্দের অর্থ খুবই সাধারণ আর তা হল রুমমেট অর্থাৎ যারা একই ছাদের তলায় থাকে। এসেছে ল্যাটিন শব্দ camera থেকে যার মানে হল রুম বা ঘর। ফ্রী শব্দ এসেছে freo থেকে যার আসল মানে হল কাছের মানুষ, সংস্কৃতে যা হল প্রিয়া। তখনকার দিনে গ্রীসে দাসপ্রথার চল ছিল। অর্থাৎ প্রতি বাড়িতে ছিল কিছু কাছের মানুষ যারা কিনা free আর কিছু দাস বা চাকর। আর কখনো যদি কোন দাস নিজের কাছের মানুষ হয়ে উঠত তাকে free করে দেওয়া হত বা প্রিয় মানুষের জায়গা দেওয়া হত। তাই থেকেই free শব্দের মানে হয় মুক্ত। পেশীর ইংরেজি প্রতিশব্দ muscle শব্দটা কিন্তু এসেছে mouse থেকে। ঠিক ধরেছেন, কেউ যখন পেশী ফোলায় মনে হয় না একটা ছোট্ট ইঁদুর চামড়ার নিচে ওপর নিচে দৌড়াদৌড়ি করছে? Favor শব্দের ইতিহাস খুব রোমান্টিক। মধ্যযুগে যখন নাইটরা বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টে অংশ গ্রহণ করত তখন মধ্য বয়সী মহিলারা কখনও চোখের কটাক্ষে, কখনো বা চুলের রিবন, পোশাকের অংশ, হাতের গ্লাভস ইত্যাদি দিয়ে উৎসাহিত করত এবং প্রেম নিবেদন করত। এই টোকেন গুলো নাইটেরা পোশাকের সাথে পড়ত। এগুলিকেই favor বলা হত। অর্থাৎ কিনা যার যত favor, মহিলা মহলে তিনি তত জনপ্রিয় মানে আজকের দিনে সুন্দরীদের সাথে ছবি তুলে ফেসবুকে পোষ্ট করার মত আর কি!

সুন্দরীদের কথায় যখন এসে পড়েছি তখন কসমেটিকসের কথাটা বলে নিতে হয়। এসেছে গ্রীক শব্দ kosmos বা cosmos থেকে। মানে হল গিয়ে বিন্যাস বা order. এই বিশ্ব বা ইউনিভার্স ভীষণ নির্দিষ্ট ভাবে বিন্যস্ত বলে একে কসমস বলা হয়। অর্থাত কিনা, মেয়েরা যখন অধীর রক্তিম করে, চোখে লাগায় মাস্কারা (আর ছেলেরা তাই দেখে পায় আস্কারা ... pardon my poor sense of humor :-)) তখন মেয়েরা আসলে নিজেদের সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত করছে।

Ostracize কথার মানে কাউকে একঘরে করা। এর ইতিহাসটা বেশ ইন্টারেস্টিং। প্রাচীন এথেন্সে গণতন্ত্র ছিল। সেখানে রাজ্যবাসী যদি মনে করত কোন পাবলিক ফিগার বা নেতা নিজের দায়িত্ব প্রতিপালন করছে না, তারা শহরের এক জায়গায় জড়ো হয়ে মাটির তৈরি ছোত ছোট টালিতে তার নামে লিখে ভোট নিত। এই টালির নাম ostrakon। ছয় হাজার বিপক্ষ ভোট সংগৃহীত হলে তাকে রাজ্য থেকে পাঁচ বা দশ বছরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হত। সেই থেকেই ওয়ার্ড ostracize. Laconic শব্দের উৎপত্তি বেশ হাসির। প্রাচীন গ্রীসে ল্যাকোনিয়া বলে একটা জেলা ছিল। সেখানকার মানুষজন খুব কম কথা বলত। কথিত আছে এক অ্যাথেনিক দূত এসে যখন তাদের বলেছিল “If we come to your city, we will raze it to the ground.” অল্প কথার মানুষ ল্যাকোনিয়ানরা শুধু উত্তর দিয়েছিল “If”. সেই থেকেই কম কথার মানুষদের বলা হয় laconic. Calculate Avi Calculus শব্দের জন্ম এক ধরণের ছোট্ট পাথর calculi থেকে যা দিয়ে প্রাচীন রোমের ব্যবসায়ীরা লাভ ক্ষতির হিসেব করত।

Narcissus আর echo দুটো এমনিতে unrelated শব্দ কিভাবে সম্পর্কিত জানতে আবার ফিরে যাই গ্রীক মাইথোলজিতে। বাতাস আর মাটির মিলনে জন্মায় পরমা সুন্দরী কন্যা Echo. Echo বড় হয়ে স্বর্গের রাণী হেরার দেখাশুনোর গুরুদায়িত্ব পেল। কিন্তু রাণী তো। একটুতেই খাপ্পা। বেশী কথা বলার জন্য ইকোকে শাস্তি দিল যে সে অন্যের কথা পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া আর কোন কথা বলতে পারবে না। তাই echo মানে প্রতিধ্বনি। এদিকে কথা বলার দিক থেকে প্রতিবন্ধী হয়েও নবযৌবনবতী echo narcissas নামে এক সলমন খান টাইপ্স হ্যান্ডু পাবলিকের প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খেতে লাগল। নার্সিসাস হল গে একটা নিম্ফের প্রেমে পড়ে নদী দেবতার গর্ভজাত সন্তান। প্রথমে নার্সিসাসের মনেও ইকোর জন্য একটু ইয়ে ইয়ে হয়েছিল কিন্তু কথা বলতে পারে না দেখে ইকোকে সে ঝেড়ে ফেলে দিল। ব্যাস মর্মাহত ইকো ধীরে ধীরে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। শুধু তার গলার স্বরটা রয়ে গেল। পরের বার পাহাড়ে গিয়ে যখন জোরে চেঁচিয়ে নিজের গলার প্রতিধ্বনি শুনবেন, আমাদের পুওর প্রেমিকা ইকোকে একটু স্মরণ করে নেবেন। এদিকে ইকোর এই অকাল মৃত্যুতে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার দেবতা নেমেসিস একেবারে রেগে আগুন তেলে বেগুন। আর তখন তো রেগে গেলেই ফটাফট অভিশাপ দিয়ে দিত দেবতারা। নেমেসিস নার্সিসাসকে অভিশাপ দিল যে সে জলে নিজেরই ছায়ার প্রেমে পড়বে। আর বলতে না বলতেই ফল। নার্সিসাস জলে নিজের ছায়া দেখে নিজের রূপেই মুগ্ধ হয়ে আর মুখ ফেরাতে পারে না। প্রতিধ্বনি ইকোকে পাত্তা না দিয়ে এখন প্রতিচ্ছবির প্রেমে পড়ে একেবারে নাস্তানাবুদ। শেষমেশ বেচারা শুকিয়ে গিয়ে ফুল হয়ে গেল। সেই ফুলেরও নাম নার্সিসাস। দেখবেন ফুলটা ঘাড় ঘুরিয়ে নিজেকেই দেখতে ব্যস্ত। আমাদের সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর নার্সিসাস রয়েছে। আপনাদের কথা জানি না আমি সর্বদাই নিজের প্রেমে গদগদ।

যাকগে যাক এবারে একটু খাওয়া দাওয়াতে আসা যাক। বাঙালি আর যাই হোক খেতে ভারি ভালোবাসে। সকালে উঠেই নিশ্চয়ই ব্রেকফাস্ট সিরিয়াল আর ধূমায়িত কফি আপনার রসনা তৃপ্ত করে। ৪৯৬ খৃষ্ট পুর্বাব্দে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে রোমান গ্রামাঞ্চলে যখন অনেক লোক মারা যাচ্ছে তখন পুরোহিতরা এসে বলে এক নতুন দেবী Ceres এর আরাধনা করতে হবে, তবেই বৃষ্টি হবে আর ফসল ফলবে। সেই ফসলের দেবী Ceres আমাদের আজকের শব্দ Cereal এর জন্মদাতা। আর মোটামুটি নবম শতকে কাল্ডি নামে এক মেষপালক দেখে তার ভেড়াগুলো একটা গাছের পাতা খেয়ে অদ্ভুত আচরণ করছে। ব্যাপারটাকে সরেজমিনে তদন্ত করতে পাতা আর ফল বেটে সেও একটু খেয়ে দেখে বেড়ে জিনিস। ধীরে সেই বেরী গুলোকে শুকিয়ে নির্যাস বের করে পান পর্ব শুরু। আরবরা তার নাম দিল qahwe. দীর্ঘ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জেগে থাকার জন্য এর সদব্যবহার হতে লাগল। ব্যাস ধর্মগুরুরা করে দিল ব্যান। সেই পানীয় আরব থেকে ফ্রান্সে এসে নাম নিলো cafe. তার থেকে coffee. এবারে আসি অন্য তরলে। রাত বাড়লে আপনার মন যদি একটু whiskey-র বোতলের দিকে ছুক ছুক করে লজ্জার কিছু নেই। নেক্সট টাইম বোতল খুলে বসার আগে ভেবে নেবেন সঞ্জীবনী জল খাচ্ছেন। না না প্রবোধ দিচ্ছি না। আক্ষরিক অর্থে ওর মানে হল water of life ওরফে সঞ্জীবনী জল। আসল শব্দটা ছিল uisge beatha. স্কচ আর আইরিশরা বানায় প্রথমে। রাজা অষ্টম হেনরি খেয়ে ভারি সুখ পান ও জনপ্রিয় করেন। পরে ধীরে ধীরে সহবতি পরিবর্তিত হয়ে usquebaugh, শেষে whiskeybaugh হয়ে শুধু whiskey.

আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক কিছু শব্দে আসা যাক। ব্যালট বা ballot এসেছে বল (ball) থেকে। প্রাচীন গ্রীকরা কোন প্রার্থীকে সমর্থন করতে একটা বক্সে একটা সাদা বল ফেলত, আর বিরোধিতা করতে একটা কালো বল। bribe মানে শুধুমাত্র একটা পাউরুটির টুকরো যা কাউকে দেওয়া হত। কারও কাছ থেকে কিছু favor পেতে কিছু দেওয়া – এই negative connotation যুক্ত হয়েছে অনেক পরে। Curfew এসেছে couvre feu থেকে ফরাসী ভাষায় যার মানে হল cover the fire. রাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে রাস্তার ও বাড়ির সব বাতি নিভিয়ে দেওয়ার নিয়ম ছিল। হ্যাঁ energy conservation এর জন্য। সেই থেকেই এসেছে curfew. গ্রেনেড দেখেছেন? আহা ঘাবড়াবেন না, সত্যিকারের দেখে না থাকলেও সিনেমা থিয়েটারে তো দেখেছেন। দেখতে অনেকটা বেদানার মত না? ঠিক সেই জন্যই pomegranate থেকে এসেছে grenade.

আমাদের অ্যালজেবরা কিন্তু আসলে একটা সার্জিকাল টার্ম। আরবিক শব্দ al মানে The, jebr মানে যা ভেঙ্গে গেছে তাকে জোড়া। ভাঙ্গা হাড় জোড়ার ব্যাপারেই বেশি ব্যবহৃত হত শব্দটা। পরে আরব গণিতজ্ঞরা সমীকরণের বীজ ভাঙ্গা জোড়াকে বোঝাতে নতুন শব্দ চয়ন করেন ilm al-jebr wa'l-muq-abalah. শব্দটা অত বড় থাকলে ক্লাস সেভেনেই উচ্চারণ করতে আমাদের একটি করে দাঁত ভেঙ্গে যেত। ভাগ্যের ব্যাপার ইটালিয়ানরা শব্দটা নেওয়ার সময় ওই দ্বিতীয় আর তৃতীয় অংশটুকুই নিয়েছে। ভাগ্যিস... কি বলেন? Chemistry তো এসেছে al-kimia থেকে। alchemist বলে একদল লোক লোহাকে সোনা বানানোর জন্য নাওয়া খাওয়া ভুলে উঠে পড়ে লেগেছিল। তারাই আজকের রসায়ন বিদ্যা বা কেমিস্ট্রির উদ্ভাবক। Honeymoon শব্দটা খুব মিষ্টি কিন্তু অর্থটা বেশ নিরাশাজনক। বেসিক্যালি এটা বিয়ের পরের এক মাসের প্রেম। moon মানে চাঁদ। প্রেমের সাথে চাঁদের সম্পর্ক চিরন্তন। ধরুন আপনার বিয়ের দিনটা পূর্ণিমা। আপনি আপনার significant other এর মুখ মিলনাকাঙ্খায় উন্মুখ। হৃদয়ে পূর্ণিমার জোছনা জলের পূর্ণ দীঘি। মন গুনগুন করছে "তেরি বিন্দিয়া রে"। পনের দিনের মধ্যেই সেই ভালবাসার রশনচৌকিতে বেসুরো সুর বাজবে। আপনার ভালবাসার রাজপ্রাসাদে অমাবস্যার অন্ধকার। চাঁদের বাড়া-কমার মতি দাম্পত্য প্রেম নিয়মিত বাড়ে কমে। চিন্তা করবেন না। আজ অমাবস্যা হলে কি হবে? আবার পনের দিন পরে পূর্ণিমা তো আসছেই।

আর একটা শব্দের কথা বলেই আজকের মত আপনাদের ক্ষ্যামা দেব। Glamour শব্দটা এখন খুব চলে। Tollywood, bollywood, hollywood এবং আরও সব "wood" এই glam girl দের রমরমা। মেয়েরা, এমনকি ছেলেরাও লুকিয়ে লুকিয়ে পার্লারে গিয়ে ভালোই মাঞ্জা মারছে গ্ল্যামার বাড়ানোর জন্য। শব্দটা এসেছে বোরিং ওয়ার্ড grammar থেকে। বিশ্বাস হচ্ছে না ? ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। প্রাচীন মিশরীয় পুরোহিতরা লেখা এবং পড়ার দক্ষতাকে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে রাখত। ক্ষমতা বেদখল হওয়ার ভয়ে এবং নিজদের ক্যারিস্মা বজায় রাখতে গোপনে মন্দিরে গিয়ে বিদ্যাভ্যাস করত। এমন কি ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলন্ডেও অল্প সংখ্যক কিছু মানুষ নিজেদের মধ্যে ল্যাটিন ভাষায় কথা বলত যাতে ইংরেজি বলা সাধারণ মানুষ তাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখে। অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ মনে করত যারা ল্যাটিন গ্রামার জানে তাদের ম্যাজিকাল পাওয়ার বা যাদুবিদ্যা জানা আছে। সেই grammar থেকেই ভেঙ্গে উৎপত্তি glamour যার আসল অর্থ ছিল ম্যাজিকাল চার্ম। আজকের দিনেও গ্ল্যমারাস গার্ল হল সে যার মনমোহিনী রূপ বা ব্যক্তিত্ব আছে – মোটের ওপর যে পুরুষের মনের ওপর যাদু করতে পারে।

আরও অনেক শব্দের জন্ম নিয়ে অনেক মনোগ্রাহী গল্প আছে। সব লিখতে গেলে আপনারা আমাকে টাটা বাই বাই করে কেটে পড়বেন। তাই আপাতত এখানেই ইতি টানছি। শব্দ দিয়ে গল্প লিখি আমরা। আবার শব্দদেরও গল্প থাকে। ভাষা সম্বন্ধে লেখা হয় যে ভাষায় তাকে "অধিভাষা" বলে। শব্দ নিয়ে লেখা এই শব্দ গুলোকে অধিশব্দ বলা যাবে কি ?

(চলবে)

স্বর্ভানু সান্যাল – জন্ম হাওড়ার রামরাজাতলায়। ছাত্রজীবন কেটেছে পুরুলিয়া, হাওড়া ও দূর্গাপুরে। কর্মজীবনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরিসূত্রে বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষ নয় বছর আমেরিকার শিকাগোয় কর্মরত। পেশাদারি এবং পারিবারিক জীবন বাদ দিলে, তার অনেকটা সময় কাটে সাহিত্যচর্চা করে। অনুগল্প, রম্যরচনা, কবিতা, স্মৃতিকথা নিয়মিত লিখে থাকেন। ''যযাতির ঝুলি'' (https://jojatirjhuli.net) নামে তার ব্যক্তিগত ব্লগ আছে এবং সেই ব্লগ এর মাধ্যমে তার লেখা নিয়মিত পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন। ব্লগটি বেশ জনপ্রিয় এবং সেটির সাথে লিঙ্কড একটি ফেসবুক পেজও আছে (https://www.facebook.com/jojatirjhuli)। প্রতিটা লেখকের মধ্যেই বাস করে তার লেখার এক চরম ও নির্দয় বিচারক। স্বর্ভানুর বিচারে সে সাহিত্য সাগরের ধারে বসে শুধুমাত্র নুড়িই কুড়িয়েছে। অন্য শখের মধ্যে আছে বেড়ানো, ফটোগ্রাফি, গান শোনা। আর অবশ্যই কারণে অকারণে একটু গড়িয়ে নেওয়া।

পল্লববরন পাল

সনেটগুচ্ছ

সনেট ৩

ত্রিপিটকে থেকে ই-মেল বা এসেমেস-এ
তুমি সনাতন বাঙ্‌ময় নীরবতা
বুদ্ধের ঠোঁটে তুমি ছিলে নীতিকথা
আমার ঠোঁটেও কথা হও ভালোবেসে
তুমি পৃথিবীর প্রথম প্রেমের ভাষা
মহেঞ্জোদারো স্নানাগারে তুমি জল
বোধিবৃক্ষের নিচে ধ্যানী-বল্কল
মোবাইলফোনে মেসেজে মেসেজে ঠাসা

সিদ্ধার্থের থেকে আজ পল্লবে
পরিক্রমায় মাত্র সতেরো দিন –
চোখের ভাষাও বুঝি অপাঠ্য হবে ?
ভাষা চলাচল করে অবয়বহীন

তুমি চিরসম্প্রীতিময় ভাষা, পালি
ঠোঁটের ওপর নির্মল গালাগালি

সনেট ৪

বুকের বাঁদিক জুড়ে চিনচিনে ব্যথা
হৃদয়ে ধরেছে পোকা – দিনরাত তাই
তামাক-আগুন টেনে কলজে ভরাই
খানিক ঝিমিয়ে থাকে নেশায় বিধাতা
ফের জাগে, এভাবেই চলে লুকোচুরি
পাশাপাশি চলে আয়ু সমান্তরালে
গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়ে কুমীরেরা খালে
টের পেতে কেটে গেলো বৎসর কুড়ি

এক্স-রে ও ব্লাডটেস্ট জানালো বিকেলে
পোকা কুরে কুরে খায় জমি অনাবাদী
হৃদয়ের, ব্যথা হয় রক্ত-টানেলে
পোকাটা ফেকলু নয় – সন্ত্রাসবাদী

নাম জানো পোকাটার ? – ভালোবাসা, পালি
অজানা এখনো নিরাময়ের প্রণালী

কর্মসূত্রে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের মাস্কাট শহরে একটি নামী বহুজাতিক কন্‌সাল্‌টেন্সি কোম্পানির চিফ্‌ আর্কিটেক্ট, আর মর্মসূত্রে আগাপাশতলা এক বামপন্থী বিষণ্ন কবি – প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫ – যার মধ্যে আছে দুটি উপন্যাস – একটি গদ্য, একটি পদ্যে লেখা। গান, ছবি আঁকা, আর পড়াশোনা – খুব কাছের বন্ধু এই তিনজন।

মৌসুমী রায়

লাদাখ ভ্রমণ

পর্ব ২

ওয়ার মেমোরিয়াল ঘুরে চলেছি হোটেলের উদ্দেশ্যে। মনটা কেমন যেন ভারি হয়ে আছে। তার ওপর সারাদিনের জার্নির ক্লান্তি। রাতটা কারগিলে কাটিয়ে কাল সকালে লেহ যাত্রা। কারগিলে ঢুকে থেকে দ্রাস নদী আমাদের সঙ্গী। সিন্ধু নদের এখানকার নাম দ্রাস রিভার। যদিও এরা সবাই সিন্ধুই (Indus) বলে। সিন্ধুর নীল জল এখানে আমাদের সাথে লুকোচুরি খেলছে। কখনো ঠিক পাশে তো কখনো পাহাড়ের বাঁকে লুকিয়ে পড়ছে। এক জায়গায় এসে দেখি এই সিন্ধু উল্টো দিক থেকে আসা সুরু নদীর সাথে মিলে বাঁয়ে আজাদ কাশ্মীরের দিকে বেঁকে গেছে। গাড়ি ডানদিকে ঘুরলো, সিন্ধুকে ছেড়ে এবার সুরুর পথ ধরলাম আমরা। হোটেলে পৌঁছতে প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গেল। বৃষ্টি পড়ছে ভালোই। রাতের অন্ধকারে নদীর কলকল শব্দ।

সকালে উঠে দেখি আকাশ কিছুটা মেঘলা হলেও বৃষ্টি নেই। চায়ের কাপ হাতে ব্যালকনিতে গিয়ে দেখি নীচে হোটেলের লনের গা ঘেঁষে চলেছে সুরু। ঠিক তার পেছনেই ধূসর পাহাড়। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা কালো মেঘ। যেকোনো ভিউ পয়েন্টকেও হার মানাবে তার রূপে লাবণ্যে। ইচ্ছে হচ্ছে এখানে এমন প্রকৃতির মাঝে আরো কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা চোখ রাঙাচ্ছে। নীচে পোর্টিকোতে গাড়ি নিয়ে তৌসিফ ভাই লাগেজ প্যাক করে আমাদের অপেক্ষায়। ঠিক নটায় ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম লেহ এর উদ্দেশ্যে।

পাহাড়ের নানা বাঁক ঘুরে কখনও ভাঙাচোরা আবার কখনো NH1 এর ঝকঝকে রাস্তা ধরে প্রায় ঘন্টা দেড়েক চলার পর এলো মূলবেক। এখানে চাম্বা মনাস্টরি। ছোট ছিমছাম শান্ত পরিবেশ। বাইরে একটাই পাথর কেটে গড়া "মৈত্রেয় বুদ্ধে"র বিশাল মূর্তি। ওপরে খোলা আকাশ। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই। মূর্তিটি তেরোশো বছর আগের বানানো। আজকের এই হাইটেক যুগে দাঁড়িয়েও দেখে স্তম্ভিত হতে হয়।

গাড়ি যতো এগোচ্ছে ততোই পাহাড় রুক্ষ হচ্ছে। সবুজের কোনো চিহ্ন তেমন চোখে পড়ছেনা। ক্রমশ উচ্চতা বাড়ছে পাহাড়ের। ১২/১৩ হাজার ফুট উঁচু নামিক লা আর ফোটু লা পার করে পৌঁছলাম লামায়ুরু। চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে তৌসিফ ভাই বললো "ইয়ে মুন ল্যান্ড হ্যায়, যাও বাহার যাকে দেখো"। গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম সবাই। দলের দুই পুরুষ সদস্য সুনীল আর কীর্তি সর্বদা ক্যামেরা নিয়ে রেডি। আমার মোবাইল-ই ভরসা। (এখানে চুপি চুপি বলে রাখি ক্যামেরাটা যখন হাতে পেয়েছি আমিও খুব একটা খারাপ ছবি তুলিনি ☺)

চারিদিকে শুধুই পাহাড়। অদ্ভুত সেই রঙ আর আকৃতি পাহাড়ের। চাঁদে মেলা পাহাড়ের সাথে মিল আছে হিমালয়ের এই অংশের। তাই এমন নাম। সত্যিই যেন চাঁদের দেশ। সেই ছোট্ট বেলায় দেখা "চাঁদের পাহাড়" সিনেমার গানটা মনে পড়ে গেল যেটা শুনলেই শুধু দুচোখ বেয়ে জল পড়তো। "এই ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ঠিক পৌঁছে যাব, ওই চাঁদের পাহাড় দেখতে পাব" ... সত্যিই যে পৌঁছে গেছি আজ। প্রকৃতির কি অপরূপ সৃষ্টি !

গাড়ি পাহাড়ের নানা বাঁক ঘুরে লামায়ুরু মনাস্টরি দেখিয়ে পৌঁছলো খালসে। এখানেই লাঞ্চ সেরে আবার চলার শুরু।

চলেছি লেহ অভিমুখে। ইতিমধ্যে পথে আরো কিছু নাম না জানা পাস পার করেছি। তবে এখনও অবধি কারোরই তেমন অক্সিজেনের সমস্যা হয়নি। তবু চিন্তা একটা রয়েই গেছে।

লেহ এর উচ্চতা ১১৪৮০ ফুট। যেখানে শ্রীনগরের উচ্চতা, সমুদ্র তট থেকে মাত্র ৫২০০ ফুট। এই দ্বিগুণেরও বেশি উচ্চতা গাড়িতে আসায় শরীর আস্তে আস্তে মানিয়ে নিয়েছে। এ রাস্তা দিল্লী থেকে অনেকেই flight এ আসেন। তাদের

একদিন পূর্ণ বিশ্রাম নেবার প্রয়োজন হয় শরীরকে মানানোর কারণে। তবে আমার মতে খুব তাড়া না থাকলে গাড়িতে এপথে আসাই ভালো। শরীরও যেমন মানিয়ে নেবে এই অক্সিজেনের স্বল্পতার সাথে তেমনই এই অপূর্ব প্রাকৃতিক শোভা থেকেও বঞ্চিত হতে হবে না।

সুন্দর ঝকঝকে NH 1 দিয়ে গাড়ি চলেছে। যেদিকে তাকাই বৃত্তাকারে পাহাড়। মাঝে বিস্তৃত উপত্যকার বুক চিরে চলেছি আমরা। দেখে মনে হয় যেন গাড়ি সোজা গিয়ে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খাবে। পথে সিন্ধু আর জঁস্কার (সুরু এর জলেই পুষ্ট) সঙ্গম পেরিয়ে গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো ম্যাগনেটিক হিলে। এখানে একটি বিশেষ অংশে গাড়ি রাখলে magnetic power এ সেদিকে টেনে নেয়, যেখানে মাধ্যাকর্ষণ বল কাজ করে না। যদিও বিষয়টার ঠিক কতোটা ভিত্তি আছে আমার জানা নেই। একটু ছবি টবি তুলে আবার গাড়িতে এসে বসলাম। এর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম লাদাখের রাজধানী লেহ।

হোটেলে ঢুকতে প্রায় চারটে বেজে গেলো। আজ এখানেই আমাদের তৌসিফ ভায়ের সাথে শেষ দিন। লেহ পৌঁছেই তার বিদায় নেবার পালা। এমন অজানা নির্জন রাস্তায় এতদিন সেই ছিলো একমাত্র ভরসা। সব রকম ভাবে সাহায্য করা ছাড়াও মনে সাহস যুগিয়েছে অনবরত। তাই মনটাও কিছুটা বিষন্ন। শুনলাম রাতেই আবার শ্রীনগর ফিরে যাবে। এখন থেকে বাকী দিনগুলো আবার অন্য গাড়িতে ঘোরার ব্যবস্থা। কাল আবার একটা নতুন দিন, নতুন বাহনে আরেক নতুন মানুষের জন্য অপেক্ষা . . . .

(চলবে)

এটাকে নাকি কাশ্মীরি গোলাপ বলা হয়!

সোনমার্গ

বালতালে অমরনাথ যাত্রীদের রঙবেরঙের ছাউনি

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ। যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে। সম্পাদকের বিশেষ অনুরোধে, ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর লাদাখ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি।

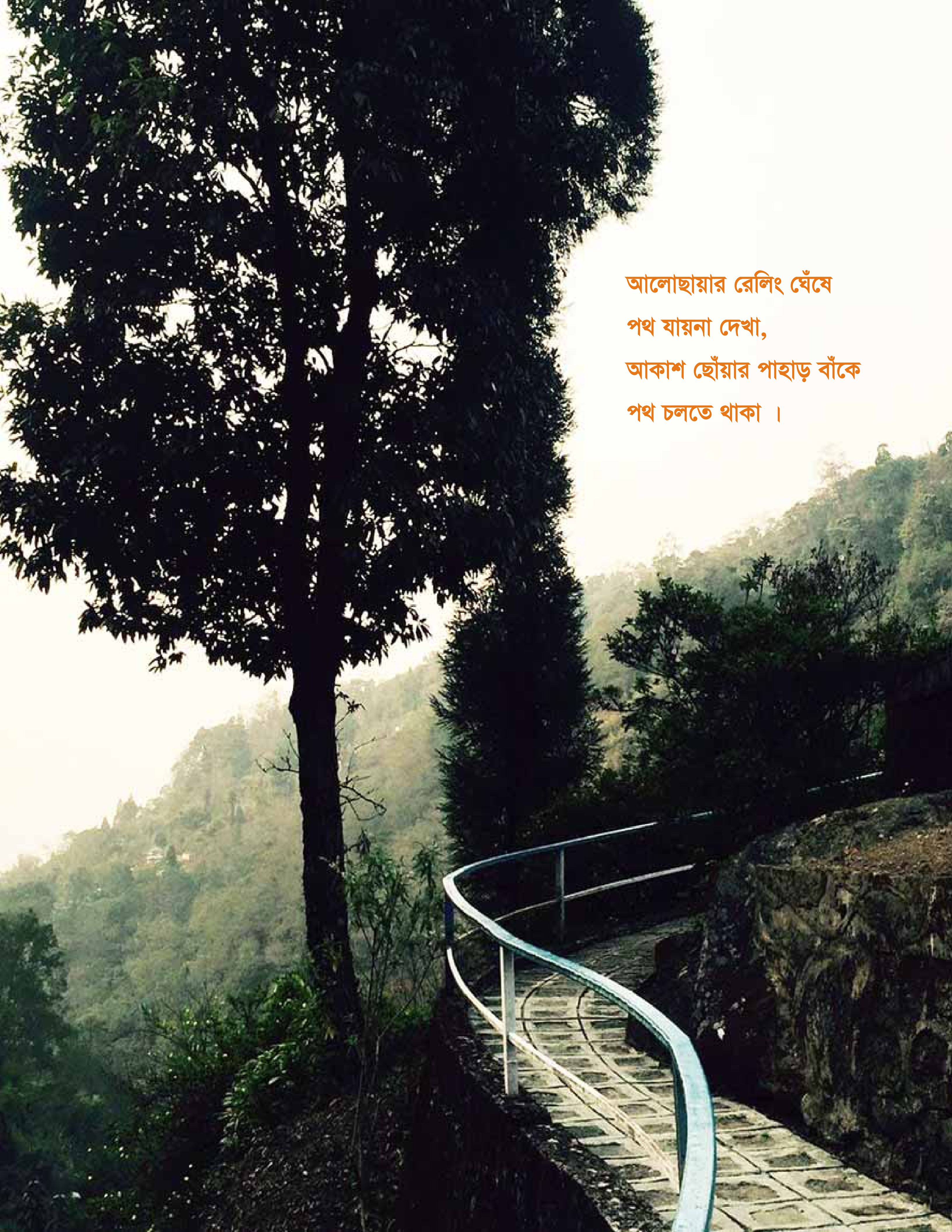
আলোছায়ার রেলিং ঘেঁষে
পথ যায়না দেখা,
আকাশ ছোঁয়ার পাহাড় বাঁকে
পথ চলতে থাকা ।